অগ্নিকণা

মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৬৯

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ সান্যাল, এম-এ, এল. এল. বি
সান্যাল এণ্ড কোং,
১-১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর :
শ্রীঅমূল্যরতন ঘোষ
অগ্রগামী প্রেস,
২০/১-এ, রামচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি লেন,
কলিকাতা ৭

প্রচ্ছদপট : শ্রীনরেন মল্লিক

দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

উৎসর্গ

অধ্যাপক
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

'মণিভিলা'
সুখচর,
২৪ পরগণা

—মিহির

এই লেখকের ঃ

মেঘ মেদুর।

ওগো সুদূর ওগো মধুর (যন্ত্রস্থ)

রূপকথা, উপকথা—গল্প কথা হলেও, এ গল্প মানুষেরই কাহিনী। রূপে ঢেকে উপমা দিয়ে তৈরী করলেও—সে উপমা মানুষেরই বাস্তব কথা। নিত্য নৈমিত্তিক এ-জীবনে এমন সব ঘটনা ঘট্‌ছে—তা এতই রূঢ় বাস্তব, কল্পনা করেও খেই মেলেনা তার। মনে হয়, দূর! এ কখনও হয় নাকি? একি সম্ভব?

যারা জানে, তারা হাসে। চুপ করে থাকে। জোর করে প্রমাণ করতে ইচ্ছা জাগলেও থেমে যায় মাঝ পথে। বলে—থাক। একথা জানিয়ে কি হবে? এ কি কেউ বিশ্বাস করবে?

সত্যি, এমনই অবিশ্বাস্ত যে বক্তারই সঙ্কোচ লাগে। স্পষ্ট করে বলতে গিয়ে বোকা বনে যেতে হয়। সঙ্কোচ আর সংশয়—দুইই দোলা লাগায় মনে। কণিকাকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে লেখকেরও সে ভয় কম নয়।

পৃথিবীতে কত নামই তো আছে। তবু ঐ নামটার কেমন যেন একটা মাদকতা আছে। জীবনে কত নামই তো শুনেছি। তবু ঐ নামটা কানে এলেই চমকে উঠেছি সভয়ে।

অবসরে একলা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসলেই হলো। এক আকাশ তারার মতন দপ্‌দপিয়ে ফুটে ওঠে তার কাহিনী। কোন্‌টা মনে রাখবো, কোন্‌টা ভুলে যাবো—তার ঠিক করতে পারি না। যেন একটা অটুট চলচিত্রের মতন সে কথা ছায়া ফেলে এগিয়ে যায় ত্রস্ত গতিতে।

মনে হয় যেন একটা গল্প। নিখুঁত নিটোল গল্প। কোন লেখক, সাহিত্যিক তার কল্পনা-রসে লেখনী ডুবিয়ে লিখে গেছে সেই অলিখিত কাহিনী।

কোত্থেকে আরম্ভ করবো তার কথা? প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিরাট ব্যাপ্তি নিয়ে যে কাহিনী, ঠিক কোথা থেকে তার সুরু করলে ভালো হবে; সেইটাই ভাবনার কথা। কোত্থেকে বলতে আরম্ভ করলে গল্প জমে উঠবে?

কণিকার জীবনে তার বিবাহটাই হলো একটা যেন উল্কাপাত্। তখন থেকেই তার রূপ পাল্টাতে সুরু করে। অনেক-চেনা সেই মেয়েটা তারপর থেকেই কেমন যেন অপরিচিতা হয়ে ওঠে। অথবা বলতে পারা যায়—এই বিবাহ পর্ব্বই তার জীবনের হঠাৎ পট পরিবর্ত্তনের একটা সন্ধিক্ষণ। সুতরাং এই পর্ব্ব থেকেই তার জীবন-মহাভারতের ওপর আলোকপাত সুরু করলে খুব অসঙ্গত হবে না হয় তো।

হ্যাঁ, "কণিকা নামে একটি মেয়ে ছিলো। তার বিবাহ হলো।"—এই থেকেই সুরু করি।

কিন্তু তবু সংশয় কাট্‌ছে কৈ? চম্‌কে উঠছি। সব কথা গুছিয়ে বলতে পারবো তো?

শুধু আমি নয়। সেদিন বিয়ের কথা শুনে কণিকাও এমনি করে চমকে উঠেছিলো। জীবনে এই প্রথম তাকে দেখতে আসছে। গোপন আনন্দে বুকটা একটু দুলে উঠলো। কিন্তু পাতাগুলো চোখের ভিজে গেলো জলে।

তারপর কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল; বুঝতে পারলো না কণিকা। দিন চারেকের মধ্যে বিবাহের সব ঠিক। মা এলো মুখে হাসি নিয়ে। এলো চেনা অচেনা গুটি কয়েক আত্মীয়-স্বজন। সকলে বেশ একটা বড় রকমের স্বস্তি পেলো। মেয়ের এমন ভাগ্য দেখে সবাই আনন্দে উৎফুল্ল। এক-দেখাতে পছন্দ। কিছু নিচ্ছে না। বরং সবকিছু তারা দিচ্ছে।

কণিকা সব দেখে। সব শোনে। কিন্তু কথা বলে না একটাও। কেবল গুম্‌রে ওঠে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায়। তাই প্রথম যখন বিয়ের রাতে শুভদৃষ্টি করলো তার জীবন-দেবতার সঙ্গে, তখন সকলে অবাক হলো।

ঝর্ ঝর্ করে জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো তার দুই গাল বেয়ে হাসির বদলে।

কেউ ভাবলো, কণি তার বাবার জন্যে কাঁদ্ছে। কেউ বুঝলো, এ অশ্রু দুঃখের নয়; আনন্দের। সবই ভগবানের দয়া। তা' নাহলে এমনটি হয় ?

কিন্তু শ্বশুরবাড়ী এসে বিস্মিত হ'লো কণিকা ভগবানের আর এক দফা দয়া দেখে। বিয়ের কনে বুঝতে পারেনি অনেক কিছু। এখন চোখ মেলে দেখ্লো সবকিছু; অন্ধকারে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো। এ কোথায় বিয়ে হলো ? কণিকার স্বামীর বয়স কম হলেও পঞ্চাশের নীচে নয়। ঘরে সতীন ছেলে, আর একটা দুধের বাচ্ছা মেয়ে।

বিয়ের আগে এসব কিছুই দেখ্তে পায়নি, শুনতে পায়নি। মামা ও মা একবারও বলেনি তাকে এ সম্বন্ধে কিছু। পাছে সে বেঁকে বসে, তাই লুকিয়েছে তাকে। ভাগ্যের এমন পরিহাসে কণিকা চম্‌কে উঠলো। ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্‌লো তার। প্রথম শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরে এসে আর যেতে চাইলো না। কত অনুরোধ, কত সাধাসাধি, কত যে কান্না— সবই ব্যর্থ হলো।

এরপর স্বামী এসেছে অনেকবার কণিকাকে নিতে। কণিকা পালিয়েছে। দেখা করেনি পর্য্যন্ত। রাগ করেনি স্বামী। আবার এসেছে। বলেছে, কণিকা এখনও ছেলেমানুষ। বয়স হলে এসব আর থাক্‌বে না।

কিন্তু কণিকা ঠিক করেছে আর সে যাবে না শ্বশুরবাড়ী। সে আবার ফিরে যাবে তার ফেলে আসা জীবনের ভুলে যাওয়া অধ্যায়ে। আচার আচরণে নিজেকে আবার গড়ে তুলবে নতুন করে। এ বিবাহ সে মানে না। ভাবে—এ আবার বিয়ে নাকি ? ধরে বেঁধে যার তার হাতে তুলে দেওয়াই কি বিয়ে ?

রাগ আসে মা ও মামার ওপর। তিক্ত হয়ে ওঠে মন স্বামীর ছল-চাতুরীর ভান দেখে।

কাঁদে কণিকা। দিনরাত কেঁদে কেঁদে ভাসে চোখের জলে! সবাই বল্‌লো তারই অপরাধ। তা' নয়তো কি? অমন স্বামী—অতবড় ঘর। কত ভাগ্য করে এসব মানুষ পায়। বর না হয় দোজ্‌বরে; তাতে হয়েছে কি?

কণিকাও বোঝে একথা। কিন্তু তবু তার মনে সাড়া আসে কৈ? কী করে প্রমাণ করবে তার মনের কথা—কোথায় ব্যথা তার? ক্লান্ত দেহে আর চিন্তা করতে পারে না। চিন্তা তো নয়—এ যে অনির্ব্বাণ চিতা। জ্বলেই চলে। যত জ্বলে ততই এর শিখা লক্‌লকে হয়ে ওঠে। শেষ কোথায়? নেবে কৈ? এত যে চেখের জল—কতটুকুই বা নেবায় তাকে! আরও ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করে। অন্ধকারে ঝাপ্‌সা করে দেয় আরও তার দৃষ্টিকে। পথ হারিয়ে ফেলে।

হারানো পথের প্রান্তে তবু কিসের আলো জ্বলে? কণিকা জেগে ওঠে। মুছে ফেলে চোখের জল।

কণিকার ঘুম ভাঙে। ঝিম্‌লাগা ভাব তার কেটে যায় ধীরে ধীরে। অসহায় বুকে জাগে কত না আশাবরী ঝঙ্কার। রাতের সমস্ত দুঃস্বপ্ন ঝেড়ে ফেলে। রাতটাইতো অন্ধকার, কালো। ভয় লাগানো, কতই না দুর্বিবহ। কিন্তু রাতই তো সব নয়। অন্ধকারই শেষ নয়। তাহলে এত আলো—ভোরের আলো এলো কোথা থেকে? কণিকা আলোয় জেগে উঠলো। সমস্ত ভয় সংশয় ধুয়ে ফেলে যেন অবগাহন করলো সেই নির্ভয় আলো-গঙ্গায়।

জীবন তার সবে সুরু। কেনই বা সারা করবে এখনই। কণিকা স্বীকার করে না—সে বিবাহিতা। প্রতিবাদ করে মায়ের কথায়, আত্মীয়দের সান্ত্বনায়। চিৎকার ক'রে বলে: না, না, আমার বিয়ে হয়নি। বিয়ে আমি করিনি।

চোখের জলে ভেঙে পড়ে মা কণিকার কথায়। কত বোঝায় মেয়েকে। কখনো রেগে ওঠেন। কখনো টেনে আনেন কোলের কাছে সস্নেহে।

—ছিঃ মা। বলতে নেই এসব কথা। আমাদের এই রীতি। সিঁথের সিঁদুরই মেয়েদের জীবনের অক্ষয় ধন—পরম কল্যাণের বস্তু।

বিরক্ত হয় কণিকা; বলে—ছাই! মিথ্যে। সব মিথ্যে। তোমরাই নষ্ট করে দিয়েছো আমার জীবনটাকে। বাবা নেই। তাই তোমাদের এত সাহস। তাই তোমরা……

ধরে আসে কণিকার গলা কান্নার সুতীব্র আবেগে। চুপ করে থাকে মা। উঠে যায় তার কাছ থেকে। শূন্য ঘরে কণিকার দিন গড়িয়ে যায় রাতের অন্ধকারে। ওঠে না। কথা বলে না। ঘুম ভাঙলে খোলা জানলা দিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে দূরের তারাটার দিকে।

ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। হাল ছেড়ে দেয় সবাই শেষে। মা বলে—থাকুক ওই ভাবে, পোড়ারমুখির যা ইচ্ছে করুক তাই। কে ওকে আটকাবে? সবই আমার ভাগ্য।

নিশ্চেষ্ট হয় কণিকার শ্বশুর বাড়ীর লোকও একদিন। জোর করে না স্বামী তার। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বয়সে তার মেয়েরই সমান। ক্ষমা করে তার সকল আচরণকে নিজগুণে। 'পরে সব ঠিক হয়ে যাবে'—বার বার জেগে ওঠে সেই একই সান্ত্বনার সুর অমল বাবুর কণ্ঠে।

ভাবে, তার আর কি? এ বয়সে বিয়ে সে করেছে তার সুখের জন্যে নয়। সংসারের জন্য। বংশ রক্ষার জন্যও নয়। দুধের বাচ্ছা ঐ মেয়েটার জন্যই কণিকাকে তার ঘরে আনা। কে তাকে দেখবে, কে তাকে মানুষ করবে? অনিমা মারা যাবার পর ঐ মেয়ে দিয়েই তাকে বেঁধে গেল এক বিষম বিপদে। না হলে, তার আর কি?

কণিকাও কেঁদে ফেলেছিলো। মরমে যেন মরে গিয়েছিল সেদিন। স্বামী যখন সব কথা বলেছিল খুলে, স্তম্ভিত হয়ে বসে পড়েছিলো। বাঁকা ধনুকের মতন ছিটকে সরিয়ে দিয়েছিল স্বামীর আবেগ ভরা হাতদুটোর আকর্ষণকে তীব্র উষ্মায়।

সান্ত্বনার প্রলেপ দেয় তবু স্বামী তাকে।

—রাগ ক'রো না ছোট বউ। বিশ্বাস করো আমায়। আমি কিছুই লুকোইনি। ওরা তোমায় মায়ের মতই শ্রদ্ধা করবে। তা' ছাড়া তুমিই এ-বাড়ীর সব। আমার যা কিছু, সবই তোমার। কোন দুঃখ, কোন অভাব নেই। শুধু ঐ দুধের বাচ্চাটাকে......

কথা শেষ হয় না। কণিকা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় ফাঁকা বারান্দায়। অন্ধকারে সেদিন ডুকরে ওঠে তার জীবনের এই প্রহসনে।

একি করলো তার মা? কেন এমন করে ধ্বংস করে দিলো তার ফুটন্ত জীবনটাকে? কি দোষ, কি পাপ করেছিলো সে?

রাতের তারা মিট্ মিট্ করে। বাঁকা চাঁদ হেলে পড়ে পশ্চিমের কোল ঘেঁসে। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝঝুম্। কণিকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেয় সমস্ত রাতটা একা একা। মনে করে ঐ তারা, ঐ চাঁদ —ওরাও কি বোঝে না তার দুঃখ? তবে ওরাও কেন আজ থাকে অমন ভাবে নিশ্চুপ হয়ে?

*　　　*　　　*

পরিবেশের প্রভাব এড়ানো সহজ নয়। মানুষ ভাবে, চিন্তা করে তার নিজের ইচ্ছামত। সঙ্কল্প যা করে—চলতে চায় সেই ভাবেই। কিন্তু পারে কই?

পরিবেশের প্রভাবে নিছক ক্রীড়নকের মতন চালিত হতে হয় তাকে। সঙ্কল্পের নিশানা করে দিক্ পরিবর্ত্তন। আর্ত্ত মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে বলে—সবই ভাগ্য। দুর্দ্দান্ত ঐ ভাগ্যই তখন পরিস্থিতির পটভূমিকা গ্রহণ করে। অস্থির ক'রে তোলে মন প্রাণ। ছক্ কাটা পথে দৃঢ়ভাবে চাল্ টিপে টিপে প্রমাণ করে আপন শক্তি। পালটে যায় পথের সঠিক নিশানা।

আশ্বাস দিলেও মা-মামার চাপে শেষ পর্য্যন্ত অমলবাবুর পিসী কোন কথাই ভাঙেনি মেয়ের কাছে। পরিবর্ত্তে বলেছিলো আর সব

কথা। —কত বড় ঘর তাদের। কত বড়লোক অমল। কত বড় বাড়ী, তাছাড়া গাড়ী, জমিজমা—লোকলস্কর। বনেদী জমিদার। আর পাত্র? স্বয়ং ভোলানাথ।

আশার রঙিন্ রাগে জ্বলে ওঠে মা মামার স্বপ্নভরা চোখ দুটো। গর্বে ফুলে যায় মামার বুকখানা। আনন্দের অশ্রু ভিজিয়ে দেয় মায়ের চোখের পাতা। দুখিনীদের প্রতি ভগবানের একি অপরিসীম দয়া? কণি কী ভাগ্যই না করেছে।

মামা বলে--রাজার ঘরে পড়েছিস্ রে, রাজার ঘরে পড়েছিস্। শুন্‌লিতো নিজের কাণেই। আর আমি তো দেখেই এসেছি নিজের চোখে। হ্যাঁ, বংশ বটে একটা। কত বড় ঘর। কত যে সুখ, কত যে আদর যত্ন পাবি—ভাবতেও পারবি না।

মার মুখেও হাসির ঝলক্।—রাজরাণী হবি রে কণি, তুই রাজরাণী হবি। পোড়া ভাগ্য নিয়ে আমার পেটে জন্মালেও—সত্যিই তোর সৌভাগ্য দেখে পাঁচজনে হিংসে করবে আজ। জামাইও খুব ভাল লোক। অত বড়লোক, তবু দেমাক নেই মনে। দয়ায় ভরা প্রাণ; যেন মঙ্গলময় শিব।

কথা ফুরোয় না মার। আবেগে বলে—আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে ভাবতেও পারিনি। এ শুধু আমারই নয় রে, তোর ও সাতপুরুষের তপস্যার ফল।

কণিকা শোনে। দিনে রাতে একই কথা সুরেলা হয়ে তার কানে বাজে। চুপ ক'রে থাকে মা—মামা, আত্মীয়-স্বজনদের কথায়। এত সুখের কথা জীবনে কখনো শোনেনি সে। তবু কী পাষাণ প্রাণ তার? এতটুকু যেন দোলা লাগে না তাতে। আনন্দের একটা ক্ষীণ নির্ঝরিণীও অকারণে ছলাৎ ক'রে ছুটে বের হয় না দু'চোখে। যত শোনে—তত সংশয় জাগে। সব সুখ, স্বপ্ন যেন কেমন ধোঁয়াটে ঠেকে।

মার অত কথাতেও তাই সাড়া জাগে না তার মনে। স্মরণ করিয়ে দেয় মা তাকে তাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা—সত্যি ভাবিনি এত

সহজে মামা তোর পাত্রের জোগাড় করবে। মনে পড়ে তো, কি অবস্থায় রয়েছি আমরা। তোর বাবা যখন অকুলে আমাদের ভাসিয়ে গেলেন, তখনকার অবস্থা····

কণির বাবার কথা উঠতে কান্নার একটা আবেগে থেমে যায় মা। শেষ করতে পারে না অসমাপ্ত কথা। চোখের জল সামলাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ধীরে ধীরে।

একলা ঘরে কণিকা বসে থাকে। জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে উদাস দৃষ্টিতে। কত কথাই না আজ মনে পড়ে। তাদের ছোট্ট সংসারের কথা। তার বাবার কথা। আরও কত কি।

* * *

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের লোক তারা। বাবা ছিলেন এক সওদাগর অফিসের কেরাণী। বাড়ী ঘরদোর সবই ছিল। তবে গর্ব্ব ক'রে কিছু বলার মতন নয়। কণিকা ছিল তার বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। আদরের সবটাই পেতো সে। ছোট্ট সংসারের সেই তো ছিল মঙ্গল-দীপ।

বাবা বলতো মাকে—লক্ষীগো, মেয়ে আমার স্বয়ং লক্ষী। দেখলে না ওর আসার পর থেকেই আমার অফিসে কেমন উন্নতি হলো। বলো-তো তাই কি না?

মার বুকটা আনন্দে ভরে ওঠে। কণির ছুই গালে চুমু খেয়ে বলে—শুধু লক্ষী নয় গো, লক্ষী-প্রতিমা। রূপে গুণে এমন মেয়ে কার কটা আছে শুনি? মেয়ে আমার সোণার-কণা, মুক্তর কণিকা। অনেক দাম দিয়ে তবে একে কিনতে হবে। দেখে নিও।

মার কথায় চোখের কোণে ফুটে ওঠে একটা রহস্ত ভরা ইঙ্গিত।

বাবা জড়িয়ে ধরে ছু'হাতে পরম আদরে। বলে—নিশ্চয়! অনেক

দাম দিতে হবে এ-রত্ন পেতে হলে। পাকা জহুরে না হলে এর কদর বুঝবে না। মা-আমার যে রত্ন-কণিকা।

'সোনার-কণা', 'রত্ন-কণা,'—সোহাগ ভরা মায়ের সে ডাকে দুলে ওঠে আজও তার মনটা। সেই 'কণা' দিয়েই বাপ মা তার নাম রাখে কণিকা। তাদের গর্ব্বভরা প্রাণের যেন আনন্দ-কণিকা।

বয়স বাড়ে কণিকার। বাবা স্কুলে দেন। গানের মাষ্টার রাখেন। কত আশা বাবার। সব দিক দিয়ে কণিকা যেন বড় হয়ে ওঠে। লেখা পড়ায়—গানে—খেলাধূলায়—যে কোন দিক দিয়ে হোক সে যেন পিছিয়ে না পড়ে।

স্বপ্ন দেখে মা। মেয়ে তাদের ছেলের সাধ মেটাবে। স্বামীকে বলে—সত্যি, মেয়ে যখন ব্যায়াম দেখায়, স্পোর্টস্ ক'রে—ওকে মনেই হয় না যে ও একজন মেয়ে। তাই না?

—সত্যিই তাই। গর্ব্ব জাগে কণিকার বাবার মনে। মুখভরা হাসিতে বলে ঃ সত্যই ওর চেহারা হঠাৎ যে এমন ভালো হবে কে জানতো? ওর স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস্ কি বলেছে জানো?

বিস্ময়ে কণির মা চোখ তুলে তাকায়।

—বলেছে, এবারে ওকে বেঙ্গল-হেলথ্-কম্পিটিসনে পাঠাবে।

কণিকা ভাবে। এসব ভাবতে তারও ভালো লাগে। শুধু কি খেলাধূলা? গানে ও লেখাপড়াতেই বা ও কম কিসের? এই তো যেদিন তাদের স্কুলের জুবিলি হলো? পর পর পাঁচ বছর ফার্ষ্ট হবার জন্য সে যখন একটা সোনার মেডেল পেলো? ওঃ সেদিন বাবার কি না আনন্দ!

বুড়ো বয়সেও কোলে তুলে চুমো খেলেন কণির দু'গালে। মাও লোভ সামলাতে পারলো কৈ? দিদিমা কুঁজো হয়ে গিয়েছিল। সে দৃশ্য দেখে কী সে রাগ তার। বলে,—ধাড়ি মেয়ের একি আদর বাবা? সাতজন্মেও এমন কাণ্ড দেখিনি বাপু। কোথায় আমি করবো আগে আশীর্ব্বাদ, তা নয়······

দিদিমার কথার অর্থ বুঝে হো হো করে হেসে উঠলো সকলে। তাড়াতাড়ি গিয়ে কণিকা বসে পড়ে দিদিমার পায়ের কাছেঃ এবার আমার মাথায় হাত পাবে তো বুড়ি? বড্ড বড় হয়ে গেছি। সে কি আমার দোষ?

টুকরো টুকরো এমনি কত ঘটনাই না আজ মনে পড়ছে কণিকার। মনে পড়ে আরও একটা ঘটনা। বাবার বন্ধু সমীর কাকুর সঙ্গে বন্যা অঞ্চলে যাওয়ার ঘটনা।

গার্লস্-গাইডে সে ছিল সবচেয়ে নাম করা একজন এক্সপার্ট্। সমাজ সেবার কত কাজে তাকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। বাবা হেসে অনুমতি দিলেও মা রাগ করেছে এতে। বলেছে—না কণি, এ আমার পছন্দ হয় না। দিন দিন বড় হচ্ছো। এখন আর এখান ওখান ঘুরে ঘুরে বেড়ানো ভালো দেখায় না। কে জানে কখন কোন্ বিপদ ঘটে?

ঝেঁঝিয়ে ওঠে বাবা একথায়। বলে—তোমার সেই এক কথা। আরে, সেবার চেয়ে বড় ধর্ম্ম আর কিছু আছে? মেয়ে তো আর নাচতে গাইতে যাচ্ছে না? যাচ্ছে সেবা করতে। তাও একা নয়। না না! এসব ব্যাপারে ওকে বাধা দিও না।

শ্রদ্ধায় কণিকার মাথা হেঁট হয়ে আসে বাবার আচরণে। সত্যি, কী সুন্দর তার বাবা। আর তাঁর জন্যেই সেবারে সমীর কাকুর সঙ্গে যাবার অনুমতি পেলো।

সে ঘটনা যেন জীবনের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি। মেদিনীপুরের বন্যার সে ভয়াবহ দৃশ্য আজও ভোলেনি সে।

সন্ধ্যে হয় হয়। কাকু এসে বললেনঃ যাবি কণি? আমার সহকারী হয়ে চ'না। তোকে পেলে মনে ভরসা পাই। বাবাকে বললেনঃ কোন ভয় নেই মিষ্টার। আমি তো আছি। তা ছাড়া কণি এসব ব্যাপারে ওয়েল্ এক্সপিরিয়েন্সড্। ডাক্তার হয়ে অনেক

ট্রেণ্ড্ নার্সের সঙ্গ পেয়েছি। হসপিটালেও অনেক ভাল ছাত্রছাত্রী দেখেছি। কিন্তু আনট্রেণ্ড্ হয়েও কণির মতন এক্সপার্ট হ্যাণ্ড খুব কম দেখেছি হে।

গর্ব্ব আসে কণিকার মনে। হঠাৎ বলে ফেলেঃ আচ্ছা কাকু আমি যদি ডাক্তারী পড়ি? আপনি আমাকে হেল্প্ করবেন তো?

রহস্য লাগে ডাক্তার কাকুর মনে। হেসে বলেনঃ সত্যি পড়বি ডাক্তারী? বাবা কি তোকে পড়াবে রে? দেখ্‌বিখন্, বৌদি তোর হায়ার-এডুকেশনের বদলে উঁচু ঘরের পাত্র জোগাড় করতে কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

—এ তুমি ঠিক বলোনি ঠাকুরপো! মেয়ের বয়স হলো। পাত্র তো একটা এখন থেকে দেখতেই হবে। কথার পিঠে মন্তব্য ক'রে হেসে ওঠেন কণির মা।

ডাক্তার কাকু চুপ করলেও কণি কিন্তু একথায় থামে না। বলে—ছাই! বিয়ে আমি করবো না। বিয়ে মানে সব বিসর্জ্জন দিয়ে পরের দাসী হওয়া। ওসব আমার ধাতে সইবে না।

হো হো করে হেসে ওঠে কণির বাবা। বলেন—দেখ্‌ছো ডাক্তার, মেয়ে এখন থেকেই কেমন হয়েছে? বলে কি না, বিয়ে মানে দাসীগিরি করা।

তারপর একটু থেমে মেয়ের হাত ধরে বলেনঃ কে তোমায় বলেছে মা, বিয়ে মানেই দাসী হওয়া? না, না। এসব কথা বলো না আর কখনো। মা শুনলে কষ্ট পাবেন।

বাবার কথায় দমে যায় কণিকা। বলেঃ তোমরা ভারি সেন্টি-মেন্টাল্ বাবা। আমি কি সিরিয়াস্ হয়ে কিছু বলেছি?—তারপর বাবার গলাটা দু'হাতে ধরে বলেঃ আচ্ছা বাবা, আমি তো তোমার একমাত্র মেয়ে। আমি লেখাপড়া শিখে খুব বড় হয়ে উঠি, একি তুমি চাও না?

—নিশ্চয় চাই। কে বলে চাই না? শোন ডাক্তার, মেয়ের

আমার কথা শোন একবার। ও ভাবে, ওর সম্বন্ধে আমরা যেন কিছু ভাবছি না।

—তবে বলো আমাকে ডাক্তারী পড়াবে ?

মেয়ের প্রশ্নে সংশয় জাগে বাবার মনে। হেসে বলে : তুই পারবি পড়তে ?

—কেন পারবো না ? স্কুলে কি আমি খারাপ রেসাল্ট্ ক'রেছি কখনো ? তা'ছাড়া ডাক্তার-কাকু রয়েছেন। উনি থাকলে নিশ্চয় পারবো ভাল ক'রে পাশ করতে।

—কেন পারবি না ? ডাক্তার কাকু সাহস দিয়ে বলেন : মনের জোর থাক্‌লে কোন কাজই অসাধ্য নয়। নিশ্চয় তুই পারবি। তাছাড়া, এখন থেকে তুই যেমন সুন্দর নার্সিং শিখেছিস্—এইতেই তো অনেকটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে।

আশ্বাস দেন বাবাও : আচ্ছারে তাইই হবে। তুই তো মেয়ে নোস্ আমার,—ছেলে। ভাল ক'রে আগে পাশ কর্। তারপর দেখা যাবে।

এর পর কতই না স্বপ্ন দেখেছে কণিকা। সে ডাক্তারী পড়বে। বাবা পড়াবেন বলেছেন। আর ডাক্তার-কাকু কথা দিয়েছেন—সব ব্যবস্থা তিনি নিজে ক'রে দেবেন। তারপর হসপিটালে ঢুকে করবে রিসার্চ, যেমন ডাক্তার-কাকু করেছেন।

সত্যিই তো সেবার চেয়ে বড় ধর্ম্ম আর কি আছে ? আর তার নিজেরও কেমন ভালো লাগে এসব। তাই সেদিন কি আনন্দই হয়েছিল তার ; যেদিন ডাক্তার কাকু তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন বন্যা-অঞ্চলে।

গাড়ীর মধ্যে ধীরে ধীরে শিখে নেয় নার্সিং-এর অন্যান্য কাজ। বুঝে নেয় কেমন ক'রে সহকারী হিসাবে সাহায্য করবে কাকুকে।

ভোর হয় হয়। আধো অন্ধকারে তাদের ট্রেন এসে থামলো এক জায়গায়। সকাল থেকেই সুরু হয় কাজ। দিনের আলো নিবে এলো। তবু অবসর মিললো না কণিকার। সারা রাত জেগে কণিকাকে এ্যাটেণ্ড্ করতে হলো এমার্জেন্সি ক্যাম্পে।

একদিন নয়। ছু'দিন নয়। পর পর দশ-দশটা দিন ধরে চল্‌লো জীবনের এক পরম পরীক্ষা-লগ্ন। অদ্ভুত ঠেকে ডাক্তার কাকুর। আশ্চর্য্য হয়ে যান ক্যাম্প-ইনচার্জ ডাক্তার মেজর বোস্। বলেন: সমীরবাবু এ রত্ন পেলেন কোথায়? হাউ স্মার্ট! হাউ ইনটেলিজেণ্ট্!

ডাক্তার কাকুও সহাস্থে বলেন: সত্যি স্তার। আনট্রেণ্ড হয়েও এমন রেসপনসেব্‌ল নার্সিং হ্যাণ্ড দেখিনি কখনো। ব্রিলিয়েন্ট গার্ল। স্কুল লাইফেও ভাল একজন স্কলার ও। স্পোর্টসে হিরোয়িন্।

—তাই নাকি? আনন্দে মেজর বোস্ বলে ওঠেন তা' ওর ফ্যামিলির অবস্থা কেমন? ওকে চ্যান্স দিক না ডাক্তারী পড়বার?

ডাক্তার কাকু এবার একটু ঢোঁক গিললেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন: দেখুন স্তার, ফ্যামিলি ওর সাধারণ ঘর। তবে ওর নিজেরও ভারি ইচ্ছে যে ডাক্তারী পড়ে। আমাকে কথা দিয়েছে, ও নিশ্চয় তার জন্য ভালো রেসাল্ট্ করবে। আমার নিজেরও ভরসা আছে ওর ওপর।

—দ্যাটস্ এনাফ্। এমন মনের জোর থাকলে নিশ্চয় ওর এম্বিসন্ একদিন সফল হবে। ওর কথা সময় ক'রে বলবেন আমায়। এ ক্যাম্পে ওর যে অভিজ্ঞতা আর দক্ষতার পরিচয় পেয়েছি—এই হবে ওর সার্টিফিকেট্ তখন।

ছুচোখ বুজিয়ে এসব কথা শোনে কণিকা ডাক্তার কাকুর কাছে। মেজর বোসের পায়ে সহস্রবার প্রণাম জানায় কৃতজ্ঞতায়। পরে ফিরে আসার সময় নিজে গিয়ে আশীর্ব্বাদ চেয়ে আনে মেজর বোসের কাছ

থেকে। মেজর বোস্ আনন্দে দু'হাত ধরে আশ্বাস দেন কণিকাকে। থ্যাংকস্ জানান তার বাবা-মাকে গভীর শ্রদ্ধায়।

শুধু কি তাই ? সরকার থেকে তাকে একটা রিওয়ার্ড দেবার জন্য প্রস্তাব করে পাঠান স্বয়ং।

ওঃ সেদিনটায় কী না আনন্দ হয়েছিল কণিকার। কাগজে বেরুলো ওর ছবি। বন্যাপীড়িতদের সেবার কাজে তার দক্ষতার কথা লেখা হ'ল আধ-কলম জুড়ে। সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হলো সরকারের পক্ষ থেকে তার নামে—১০০ টাকার প্রীতি-পুরস্কার।

বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেরই মুখে চোখে সে কি আনন্দ আর গর্ব্ব। মা ফুলে ওঠেন মেয়ের ভাগ্যের অহঙ্কারে। বাবা ঝগড়া বাধান মার সঙ্গে। বলেন : দেখলে তো মেয়ে আমার কত গুণের ? ও যদি তোমার মেয়ে না হ'ত, দেখতে ওকে যে ক'রে হোক বিদেশ পাঠাতুম।

রেগে ফেটে পড়ে মা। —ঢং দেখ না কথার ? মেয়ে বুঝি আমার নয় ? কান্নার ভান ক'রে চড়া গলায় বলেন : ও বুঝি আমার পেটে হয় নি ? ও বুঝি কেবল তোমারই ?

গম্ভীর হয়ে যান বাবা। লজ্জা আসে কথার অসংলগ্নতায়। হেসে মার হাতটা ধরে বলেন : ঘাট্ হয়েছে আমার। বাব্বাঃ! মুখ দিয়ে একটা কথা ফস্ করে না হয় বেরিয়েই গেছে। আরে মেয়ে আমারও নয়, তোমারও নয়—দু'জনের।

খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে মেয়ে মা-বাবার সে তামাসার দ্বন্দ্ব দেখে। তারপর মাকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলে : আমি তোমারই মেয়ে হব ; যদি একটা শপথ কর।

মেয়ের কথায় হেসে ফেলে মা। বলে : কি শপথ ?

—আমার বিয়ের জন্যে বাবাকে আর তাড়া দেবে না ?

—আমি শপথ করছি কণি। হঠাৎ ওপাশ থেকে মার বদলে বলে ওঠেন বাবা।

মুখ ঘুরিয়ে আবার ঝেঁঝিয়ে ওঠে মা—ঢং দেখনা। একি অলুক্ষুণে শপথ আবার! মেয়ে কি ঘরে রাখবার জিনিষ? ওঁর আর কি। না চেষ্টা ক'রতে হ'লেই বেঁচে যান।

বাবা কি একটা তাড়াতাড়ি বলতে যাচ্ছিলেন এ কথার উত্তরে। কিন্তু হঠাৎ কণির হাত ধরে মা দরজা ঠেলে চ'লে গেলেন অন্য ঘরে। অর্থাৎ, মেয়ে যে তাঁরই, সেইটাই যেন প্রমাণ ক'রে দিয়ে গেলেন এইভাবে।

* * *

কণি বড় হ'য়েছে। তা নয়ত কি? এবছর ম্যাট্রিক্ পরীক্ষা দিচ্ছে। বয়স হ'য়েছে পুরো ষোল।

সে তো অনেকেরই হয়। মেয়েরা সাধারণতঃ একটু বেশী বয়সেই পাশ দেয়। কিন্তু কণির আসল বয়স ওর চেহারা।

যথার্থই স্বাস্থ্যবতী সে। যেমন দেহের আয়তন, তেমনি ঢেঙা। দেহের যত্ন তার প্রথম থেকেই। নিয়মিত ব্যায়াম করে—জিমনাষ্টিক্ প্র্যাক্টিশ করে। হেলথ্ কম্পিটিসনে নাম দেয়। বুকের ওপর ভার তোলে। তারের ওপর ব্যালেন্স্ রাখতে তার মত পটু তার ক্লাবে খুব কমই ছিল। কতবার প্রাইজ্ এনেছে কৃতিত্বের সঙ্গে। বন্ধুরা হেসে বলেঃ জানিস্ কণি, আসলে তুই একটা পুরুষ মানুষই। ভগবান হঠাৎ কাজের তাড়ায় ফিনিসিং টাচ্‌টা দেবার সময় ভুলে মেয়ে ক'রে গ'ড়ে ফেলেছে।

হেসে ওঠে সকলে হো হো ক'রে। বাবাও বলেঃ মেয়ে যেন দিন দিন ধাংড়ী তৈরী হ'চ্ছে। রহস্য করে মাকে শোনায়ঃ বুঝলে, ওর বর খুঁজতে শেষ পর্য্যন্ত রাজপুতনা বা পাঞ্জাবে না যেতে হয়।

মা কথা বলেনা। উঠে মেয়ের কোড়ে আঙুলটা দাঁত দিয়ে একটু কামড়ে থু থু করে তিন বার। তারপর ঝেঁঝিয়ে বলে—দিন নেই খ্যান্ নেই, অমন সব কথা পাপ মুখে না আনলেই নয়?

এরপর আর কথা বাড়ায় না বাবা। আরও হেঁট হয়ে নিজের কাজে মন দেয় তাড়াতাড়ি।

কণিও কত সময় লম্বা আরসিটার সামনে দাঁড়ায়। গর্ব্বের সঙ্গে লক্ষ্য করে দেহের সবল পেশী গুলোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। শুধু কি চেহারা? গায়ের রং! তাই বা তার কম কোথায়? অনাবৃত দেহের লাবণ্য যেন একরাশ হাসি এনে ছড়িয়ে দেয় তার মুখখানায়।

মিথ্যে গর্ব্ব নয়। সত্যি কণির দেহের সৌন্দর্য্য চোখে ধরবারই মতন। আলেয়া নয়, যথার্থই সে আলো। চোখ, মুখ, সারা পিঠ জুড়ে একরাশ ঘন কালো কুচকুচে চুল—শিল্পীর তুলিরই যেন সব নিখুঁত আঁচড়।

ছেলের দল মুগ্ধ হয় তাকে দেখে। হিংসে করে মেয়েরা। ঘরের বৌ করবার লোভ জাগে অনেক অভিভাবকের মনে মনে। প্রস্তাবও হ'য়েছে গোপনে মায়ের কাছে। তাও শুনেছে কণিকা।

কেন, বোসেদের বাড়ীর ঐ অশোক?

অশোকের কথা মনে এলে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে কণিকার মন। কত সময়ই না সে কাটায় সেই ভাবনার মধু স্মৃতিতে।

কণির মন্দ লাগেনা অশোককে। প্রশংসা করার যোগ্যই সে। বি. এ. পড়ছে। খেলা-ধূলো, গান-বাজনা সব দিকেই এক্সপার্ট। দেখতেও মন্দ নয়। সবার ওপর, অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে।

অশোকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট আলাপ। কত দিনই ত' স্কুল থেকে পালিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে এখানে ওখানে। গল্প করেছে কত। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা এসেছে এমন কতদিন। তবু তাদের গল্প থামেনি। দুজনেই ভেসে যেত রূপকথার এক অচিন্ দেশে। যেখানে একমাত্র সজীব প্রাণী তারা ছাড়া আর কেউ থাকত না।

এই অশোকের মাও এসেছিল একদিন তাদের বাড়ীতে। মার সঙ্গে গোপনে বেয়ান্ পাতিয়ে পাকাপাকি করে ফেলেছিলেন এক রকম। কণিকে তাদের ভারী পছন্দ। তারা যেন অন্য পাত্রের জন্য আর ব্যস্ত না হন।

ঘন ঘন ও বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পড়তো কণির। ভারী খুশী হ'তেন অশোকের বাবা মা। কাছে ডেকে আদর করতেন। 'মা'-ব'লে পাশে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন খবরাখবর। বলতেন : মা, আমার রাজলক্ষ্মী যেন। কত ভাগ্য ক'রেই না এমন রত্ন পাওয়া যায়।

মাঝে মাঝে বেশ লজ্জা লাগত। রাঙা হ'য়ে উঠত কণিকার কান ছু'টো অকারণে। মার কাছে ফিরে এসে কিছু ব'লত, কিছু চেপে যেত।

মা হাসে। তারপর এক সময়ে জিজ্ঞাসা করে : ওদের তোর ভাল লাগে ? ও-ঘর পছন্দ হয় ?

'ঘর' কথার দ্ব্যর্থ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কণি। তাই বেশ সহজ ভাবেই ঘাড় নাড়ে : খুব ভাল লাগে। জানো মা,—উচ্ছল হয়ে ওঠে কণি : ওঁরা আমায় ভারী স্নেহ করেন। 'মা' বলে এমন ডাকেন, সকলের সামনে ভারী লজ্জা লাগে আমার।

উৎফুল্ল হন মা মেয়ের কথায়। নির্জ্জনে ছু'হাত মাথায় ঠেকিয়ে ভগবানকে স্মরণ করে। সবই তোমার দয়া ঠাকুর। তুমি ওর মঙ্গল করো।

পাড়ার লোকেরাও বুঝতে পারে মিঃ বোস্ শীঘ্রই অশোকের সংগে বিবাহ দিয়ে ঘরে আনবেন কণিকাকে। গর্ব্ব করে কণির বাবা আত্মীয়দের কাছে ভাবী জামাইয়ের পরিচয় বর্ণনা ক'রে।

অশোকের নিজের মুখ থেকেই কণিকা শুনেছিল তার বাবা-মা'র গোপন ইচ্ছার কথা। ছু'জনেই ঈষৎ লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠেছিল সে আলোচনায়। প্রথম প্রেমের অনাস্বাদিত মধুঘ্রাণে ছুজনেরই বুক ছুলে উঠেছিল এক অজানা দোলায়।

*   *

সেদিনটা ভুলবেনা কণিকা জীবনে কখনো। অবিস্মরণীয় সেই মধু-ক্ষণটা, কেই বা হয় বিস্মরণ ?

অশোকের জন্মদিন।

অনেকের মধ্যে কণিকার নিমন্ত্রণ আর আপ্যায়নটাই ছিল সব চাইতে বেশী সেদিন। বাবা রহস্য ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন : হ্যাঁরে বুড়ি, অশোককে আজ কি দিবি ?

জন্মদিনে কিছু দিতে হয় সত্যি। কিন্তু কণিকা ভেবে ঠিক ক'রতে পারেনা। কিই বা আজ দেবে তাকে। মা বলে : একখানা বই দে কণি। অশোক বই-ই পছন্দ করে। বাবাও এ প্রস্তাবে ঘাড় নাড়েন।

মা—বাবার কথা শুনে তাই সে দিতে রাজি হয়। কিন্তু তবু সংশয়। ওটা তার লোক-দেখানো দেওয়া। মনের মানুষকে আরও কত কিই না তার দিতে ইচ্ছে করে। উত্তেজনায় আর গভীর আবেগে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার সমস্ত দেহ মন। সত্যি অশোককে এর আগে আর এত আপন জন বলে মনে ভাবেনি কখনো। সারা সকাল থেকে সমস্তক্ষণ তার চিন্তাই সুর তোলে কণিকার অবচেতন-মনে। াক দেবে আজ তাকে ?

টবের রজনীগন্ধার এক ঝলক্ মিষ্টি বাতাস আরও পাগল করে দেয় তাকে। সব কাজেই আজ আল্‌সেমি লাগে। উদাসী চোখ দুটো শুধু বার বার চেয়ে থাকতে চায় আধ্‌ফোটা কুঁড়ি কুঁড়ি ঐ গোলাপটার দিকে।

সন্ধ্যে হ'ল। আকাশ-উঁচু দূরের কৃষ্ণচূড়াটার ফাঁকে একফালি চাঁদটা উঠে এল চুপি চুপি। কেন যে কণিকা আজ এত সাজলো—বুঝেও বোঝে না। বার বার গিয়ে দাঁড়াল লম্বা আরসিটার সামনে। দেখলো নিজেকে কত ভাবেই না ঘুরে ঘুরে।

এমন ক'রে কোন দিন এর আগে ফিরে তাকায়নি নিজের চেহারাটার দিকে। গর্ব্ব নয়। এক অসীম কৃতজ্ঞতায় প্রণাম জানালো ভগবানকে। সে সুন্দর। কত সুন্দর করেই না তাকে গড়ে তুলেছেন বিধাতা। কিন্তু অশোকের কি ভাল লাগবে তাকে ?

সুঠাম সুশ্রী দেহে সবুজ ফিকে শাড়ীটা কোঁচ দিয়ে প'রেছে সে।

টানা টানা চোখ দুটোয় কাজল টেনে তাকে ক'রে তুলেছে কতইনা মোহনীয়। রিবন দিয়ে ফাঁপিয়ে বেঁধেছে চুলের গোছা। আল্‌তো ভাবে দু' একটা কোঁকড়ানো চুল ইচ্ছে ক'রেই ছড়িয়ে দিয়েছে প্রশস্ত কপালটায়। আর খোঁপার এক পাশে গুঁজেছে আধ্‌-ফোটা সেই রক্ত গোলাপটা।

—'অভিসারিকা রাধা'—হেসে বলে ফেলে অশোক তার দিকে চেয়ে। মুগ্ধ দুই চোখে অনেক্ষণ তাকিয়ে থাকে। ভারি অস্বস্তি ঠেকে কণিকার। কেঁপে ওঠে বুক খানা থর থর করে। বোঝে, তার মত শ্রেষ্ঠ দেহী—মনে কতইনা দুর্ব্বল, ভয়ার্ত্ত।

নিস্তব্ধ ছাদের একটা আধ্‌ছায়া নির্জ্জন কোণ। বেলের গন্ধে আবিল পরিবেশটা। মাথার ওপর এক ঝাঁক মিট্‌ মিটে তারা। একটু বামে দুষ্টু চাঁদটা।

বিস্মিত অশোক। অভিভূত কণিকা। দুটি নিথর ছায়া যেন প্রকৃতির নির্বাক চিত্রপটে। হঠাৎ দূরে ডেকে ওঠে একটা কোকিল কু-কু ক'রে। চমক ভাঙে দু'জনের। অশোক চাপাস্বরে ডাকে—কণি, আজ কি দেবে আমায়? শুধু বই?

কণিকার কণ্ঠ নীরব। এত কাছে—এমন পরিবেশে এই সে প্রথম। এক সময় মুখটা জোর ক'রে তুল্‌তে গিয়ে দেখলো অশোকের তপ্ত ঠোঁট দুটো ঠেকে গেল তার কপালটায়।

কয়েকটা মুহূর্ত্ত। দুজনের অধর দুটো রঙিন্‌ হ'য়ে উঠ্‌লো এক কোমল নিষ্পেষণে। খোঁপার গোলাপটা খুলে নিয়ে কণিকা গুঁজে দিল আশোকের জামার বোতামে সযত্নে। তারপর ধীরে ধীরে তার সবল হাত দু'খানার বাঁধন খুলে পালিয়ে গেল ত্রস্ত পদে।

* *

সর্বনেশে সে রাতটা আজও স্পষ্ট মনে আছে কণিকার। কুমারী জীবনের প্রথম ফোটা ফুলের মধু কি বিশ্বাসেই না সে তুলে ধরেছিল

তার পিপাসার্ত্ত অধরে। বিরাট্ আশ্বাস। নির্ভয় ভাবনা। অশোক তারই। হ্যাঁ, একেবারেই তার। কেউ সে মধু-ভাণ্ডে বাড়াবে না কোনদিন লোভীহাত।

এ-মিল্ জোর ক'রে হয়নি তাদের। ছিল না কোন শপথ বা সর্ত্ত এর পেছনে। সাক্ষী—সবুদ্ কেউ নেই এ বন্ধনের।

দু'জনের মন, আর প্রীতি-ভরা অচ্ছেদ বিশ্বাস—এই ছিল তাদের মূলধন। রূপ তাদের আকর্ষণ করলেও—মুগ্ধ করেছিল তাদের অভিন্ন গুণ। এ জীবন-যজ্ঞের হোতা ছিল শুধু কলঙ্কিনী চাঁদ। বাঁধনের সূত্র ছিল—আধ্ফোটা গোলাপ। আর মন্ত্র ছিল—দুজনার অনাঘ্রাত প্রেম।

উভয়ের কণ্ঠে ছিলো শুধু উভয়ের কথা। আর কিছু নয়। আর কারো নয়। অশোক বলেঃ আমি জার্মাণী যাচ্ছি কণি, প্রিণ্টিং এ্যাপ্রেন্টিস্ হয়ে ফিরে এসে বাবার নিউজ পেপারের সব দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে কিনা।

আনন্দে কণিকা বলে ওঠেঃ নিশ্চয়ই যাবে। তুমি বড় হলে আমার কত গর্ব বলতো? তারপর কিছুক্ষণ তার হাত দু'টো নিজের নরম হাতের মধ্যে চেপে ব'সে থাকে স্তব্ধ হয়ে। যেন স্বপ্ন দেখে তাদের উজ্জল এক সুন্দর ভবিষ্যতের।

অশোক আবার জিজ্ঞাসা করেঃ আর তুমি? ডাক্তারী প'ড়বেনা?

—হ্যাঁ, আমিও প'ড়বো। বাবা বলেছেন পড়াবেন। ডাক্তার-কাকুও আশ্বাস দিয়েছেন। এখন তুমি.......

দুলে ওঠে অশোকের চওড়া বুকটা উত্তেজনায়। অসমাপ্ত কথার মাঝেই কণিকার কাঁধ দু'টো ধরে বলে ওঠেঃ আমার অনুমতি? অনুমতি কি বলছো কণি? আমার সবই ত' তোমার। ডাক্তারী পড়ার সব খরচা বাবাই তোমায় দেবেন। তোমার কথা তিনি অনেক আগেই শুনেছেন।

এত সৌভাগ্য—এত সুখের কথা কণিকার যেন স্বপ্নেরও অগোচর। আশাভরা বুকটা কাঁপে তার থর থর করে। আবেগে অশোকের হাত দুটোয় মাথাটা গুঁজে নিশ্চুপ হ'য়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ ধরে।

স্বপ্ন! হ্যাঁ স্বপ্নই বটে। আশা-ভরা ছোট্ট প্রাণের তরণী বেয়ে ভেসে চলে কণিকা। বিন্দু বিন্দু দিয়ে যেমন গড়ে উঠেছে সিন্ধু, তেমনিভাবে কণা কণা আশা দিয়ে গড়ে তোলে তার জীবন কণিকা। সঙ্কল্পের পেয়ালায় রঙীন স্বপ্নের সুরা ঢেলে ঢেলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। তবু আশা মেটে না। পিপাসার্ত্ত মরু-মনটার তথাপি তৃষ্ণা ঘোচেনা। আরও চায় সে। পেয়ে পেয়ে হ'য়ে ওঠে লোভাতুর।

দোলা লাগে প্রাণে। ফুল ফোটে গানের কলিতে। চাঁদ হেসে দীপ জ্বালে নিস্তব্ধ রাত্রির নিঃসঙ্গ কামনায়। চকোরের মত আসক্তি ভরা সজাগ দৃষ্টিতে কণিকাও চেয়ে থাকে নিষ্পলকে।

বাঁশী বাজে। স্পষ্ট শোনে সে। ঘুম ভেঙে যায় তার মধুর ধ্বনির ইঙ্গিতে। কিন্তু তবু ঠিক বুঝতে পারে না তার অবুঝ্ ভাবটা। নিশানাও হারিয়ে ফেলে তাই।

যমুনা পুলিনের বাঁশীও এমনি ডাকতো একদিন। ধ্বনিতে ইঙ্গিত করতো এমনিভাবেই ছল্-করা ঘুমে-ঢলা সমস্ত ব্রজঙ্গনাদের। ঘুম ভেঙে যেতো শ্রীরাধার ক্লান্ত মনের। ত্রস্ত হয়ে উঠতো। অভিসারের মধু লগ্ন ওই বুঝি বয়ে যায়? থেমে যায় ঐ বুঝি বাঁশরীর সুর-নিশানা।

ঘন কালো অন্ধকার। আকাশ চিরে নামে অশান্ত বারিধার্। পিছল্ পথ প্রতি মুহূর্ত্তে জাগায় আশঙ্কা—পদস্খলনের। নাগিনী করে ফণা-বিস্তার। তবু চলে রাই। দুরু দুরু বুকে গুরু গুরু মেঘের ডাক্ তোল্পাড় করে দেয়। তবু থামেনা তার অভিসার। সুতীব্র আকর্ষণে কক্ষচ্যুত হয়ে ছুটে চলে প্রিয়তমের নির্ভয় কোলে।

কণিকা ভাবে—এ বাঁশীও কি সেই বাঁশী? শ্যামের নির্ভয় আশ্রয়ের সু-ইঙ্গিত? অশোকের ওপর তার বড় ভরসা। বিপুল বিশ্বাস।

শুধু সে কেন? ওর মা বাবাও পরম আশ্বস্ত। ঝগড়া তাদের কমে গেছে। শপথও আর কণিকাকে করাতে হয়না তাদের। মেয়ে যে এখন সত্যি কারুরই নয়—বুঝেছেন তাঁরা। মেয়ে পরের। পরের ঘরের জন্যই তাকে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে মানুষ ক'রতে হয় তিল্ তিল্ করে। স্বামীর ঘরই মেয়েদের একতম আশ্রয়। স্বামীর ভালবাসাই চরমতম পাওয়া। স্বামী সেবাই ইহ-জীবনের পরম ব্রত।

পুরানো দিনের ঠাকুমা-দিদিমার উপকথা নয়। আজকের দিনেরও মা-বাবাদের মুখর সান্ত্বনা। গোপনে নয়, প্রকাশ্যেই কণিকার মনকে তেমনি ভাবে গ'ড়ে তোলেন তার বাপ মা। আবেগে বলে ওঠেন মা ঃ অশোকের মতন স্বামী পাওয়া কণির ভাগ্যই বটে।

বাবা শান্তি পান—নিশ্চয়। মেয়ের যোগ্যই সে বর হবে। তবে আমার কি সঙ্কোচ জানো? ওরা অত বড়লোক, আমরা কি সবক্ষেত্রে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চ'লতে পারব?

—বড়লোক আছে তো বড়লোক আছে। একটু ঝেঁঝিয়ে ওঠেন মা। আমরা তো এগুইনি। ওরা নিজেরাই কণিকে পছন্দ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। এতে আবার পাল্লা-পাল্লির কি আছে শুনি?

বাবা থেমে যান এর পর। কিন্তু কণি থামতে পারে কই? সেও যে এ-দিকটা ভাবেনি তা নয়। অশোক একজন বড় মার্চেন্ট্ ম্যানের ছেলে। আর সে একজন সাধারণ কেরাণীর মেয়ে। সত্যই তো ওদের সঙ্গে যথাযথ পাল্লা দিতে তারা অপারগ।

কিন্তু টাকার অঙ্কের পাল্লাই কি প্রাণের ভালবাসার মানদণ্ড? প্রেমের ইঞ্চি কাট? ছিঃ ছিঃ। তার আর অশোকের মধ্যে কি এই সম্পর্কই তাঁরা অনুমান করেন?

অশোকও কি করে নাকি? কে জানে? এমন ভাব তো কখনো দেখেনি সে। বরং টাকা বা সম্পত্তির কথা উঠলে সে চটেই যেত। বড়লোক ব'লে কণিকা তাকে কখনও ইঙ্গিত করলে, তার অভিমানই হতো। ব'লত ঃ মানুষকে অত নীচ মাপকাঠিতে মেপো না কণি।

ওপরের পোষাকটাই সব নয়। ভেতরে আরও একটা পোষাক আছে মানুষের। সেটা দেখবারই চেষ্টা কর।

রাগ করতো না কণিকা। হেসে ফেলে আরও রাগিয়ে দিত অশোককে। ও রাগ ক'রলে ভারি সুন্দর দেখতে হ'ত। তাই কণিকা আবার বলে: কি জানো, বাবার বড্ড ভয়, কি ক'রে তোমাদের সঙ্গে একতালে পা ফেলে চলবেন? তোমাদের ঘরে কি করে আমাকে দেবেন?

চুপ করে থাকে অশোক এ কথায়। একটা গোপন অভিমানে চঞ্চল হয়ে ওঠে তার সরল মনটা। ভাবে, টাকাকড়িই যেন মানুষের সমাজে সব কিছুর তুলাদণ্ড। কণিকাও বুঝি ঐ মাপেই বিচার করে তাকে। একটু চুপ থেকে বলে: তোমার দাম কত কণি?

হঠাৎ এ ধরনের কথায় রহস্য লাগে কণিকার। চাপা হাসিতে চোখ তুলে এবার তাকায় অশোকের মুখটার দিকে। তারপর গম্ভীর হ'য়ে বলে: অনেক। তোমার চেয়েও বেশী। পারবে অত দাম দিয়ে কণিকে কিনতে?

—কত দিলে তোমার বাবা মা সন্তুষ্ট হন?

আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে কণিকা। বলে: এতো হাত দিয়ে গুণে বলা যায় না। মন দিয়ে আর একটা মনকে মেপে,—ভালবাসা দিয়ে গুণ ক'রে........

আর বলতে পারে না কণিকা। খিল খিল করে হাসির একটা প্রবল উচ্ছ্বাসে লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে।

অশোকও হেসে ফেলে শেষ পর্য্যন্ত হো হো করে। তারপর দু'হাতে জোর করে তাকে বুকের কাছে টেনে এনে বলে: খবরদার। আর যদি কোন দিন টাকা-কড়ির কথা তুলেছো দুষ্টু, তাহলে একদম আড়ি। মনে থাকে যেন?

* *

কণিকা এ কথাও মনে রাখে। আজ তার এই মনে- রাখার কথায়

হাসি আসে ঠোঁটের কোণে। তবে এই হাসি সেদিনের সেই দুষ্টুমি ভরা আমোদ-করা হাসি নয়। একটা উদাসীন মনের ঘৃণিত অবহেলার হাসি। একটা উন্মত্ত হৃদয়ের বিকৃত হাসি। এতে মধু ঝরে না ঝলকে ঝলকে। অভিশপ্ত প্রাণের হাহাকারে-ভরা তিক্ত বিষ ক্ষরে পড়ে মুহুর্মুহুঃ।

ভাবতেও ভয় করে কণিকার সে কথা আজ। স্বপ্নেও যদি ভেসে আসে সে স্মৃতি, বিতৃষ্ণায় দগ্ধ হ'য়ে যায় মন। অল্প বয়সে ততটা বোঝেনি এর গুরুত্ব। শুধু কেঁদেছে। দিন রাত ধরে শুধু ভিজিয়েছে নিজের জামাটা।

শুধু সে নয়। কেঁদেছে আরও অনেকে। তবু সব চেয়ে বেশী মর্ম্মান্তিক কান্না ভেসে উঠেছিল মার কণ্ঠে। বুকফাটা চিৎকার নয়। গুম্‌রে গুম্‌রে ফেটে পড়া বিস্থবিয়াসের কান্না। ফুলে ফুলে আছ্‌ড়ে পড়া রাক্ষসী পদ্মার সুতীব্র জলোচ্ছ্বাস্।

এও কি সম্ভব? 'না-না'—করে চিৎকার করে উঠেছিল কণিকা সেদিন। কান্নায় ভরিয়ে তুলেছিল অন্ধকার ঘরখানা বার বার। দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল বেশভূষা, সাজ-পোষাক লজ্জার কশাঘাতে। কতদিন মুখ দেখায়নি কাউকে। 'কালা মুখ'—বলেছিল নিজের মুখ খানাকে। কতদিন দাঁড়ায়নি আরসির সামনে। হাসেনি কতকাল। ভুলে গিয়েছিল সব কিছু—খেলাধুলা, লেখা-পড়া, গান-বাজনা, আত্মীয়-স্বজন।

ঘৃণা। তীব্র বিষের মত ঘৃণাই তার সমস্ত মনটাকে বিষিয়ে তুলেছিল তখন। ঘৃণা এসেছিল নিজের ওপর।—তার দম্ভ, তার বিশ্বস্ততা, নির্ভয় আশ্বাস—সব কিছুর ওপর। ঘৃণা এসেছিল ভগবানের ওপর পর্য্যন্ত।

পাগল হয়ে যায়নি সে। কাঁদতে কাঁদতে শুধু পাথরের মতন কঠিন জড় পদার্থ হয়ে গিয়েছিল যেন। প্রথম প্রেমের রঙীন্ মায়া-সাগরে ডুব দিয়ে, মুক্তোর বদলে ঝিনুকের খোলা কুড়তে কুড়তেই অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। হারিয়ে ফেলেছিল তার স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি।

একটা যুগের ঘটনা নয়। অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের একটা ছায়াছবি। নিদারুণ পটভূমিকা। করুণতম কাহিনী। হাসি কান্নার ক্ষণিক দৃশ্যান্তর।

আকস্মিক ভাবে মারা গেল অশোকের বাবা। বিরাট ব্যবসায়েও ঘটলো নিদারুণ অঘটন। ক্ষতি হয়ে গেল লক্ষ টাকার কাগজী-ব্যবসা রাতারাতি। দেনার দায়ে ক্রোক ক'রল সম্পত্তি পাওনাদারেরা।

বিনা মেঘে বজ্রাপাত হ'লেও হয়ত বিশ্বাস করা যেত। কিন্তু এমন পর পর দুর্ঘটনায় হাহাকার করে উঠলো অশোকেরা। অথৈ জল। কূল নেই। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল নিরন্ধ অন্ধকার।

কেঁপে ওঠে কণিকা। ভেঙ্গে পড়ে বাবা মার আশা ভরা তরীটুকু। দম্‌কা ঝড়ে তলিয়ে যায় সাগর তলায়। সান্ত্বনা দেবে কে কাকে? বাঁচাবে, কার খেয়া কারা? তাদের নিজেদের শক্ত হালই ত' রশি ছিঁড়ে ভেসে গেছে জলে।

হাসি ফুটে ওঠে স্বষ্টিকর্ত্তার ভ্রুকুটিতে। খেলা দেখেন দূর থেকে আনন্দে। কেমন দুঃসহ সুন্দরই না তার স্বষ্টি-খেলা। ভাঙ্গা আর গড়া। ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে গড়া। আবার গড়তে গড়তে ভাঙ্গা। কী অপূর্ব রহস্যই না তাঁর পুতুল খেলার। বেদনায় বুক ফাটে পুতুল-মানুষের,—গান জাগে তাঁর কণ্ঠে। চোখ ফেটে রক্ত-অশ্রু গড়িয়ে পড়ে হুতাশে,—খুশীর শিল্পী রং ধরায় তুলিতে সেই রক্ত-রং-জলে। কণিকাও কাঁদে। আবার হাসে। ভাবে বিভোর হ'য়ে পড়ে ভগবানের সেই মত্ত খেলার নেশায় উন্মত্ত হ'য়ে।

ঝড় ওঠে আকস্মিক ভাবে। আবার থামে। বৃষ্টি ধারা ক্ষান্ত হয় ক্লান্ত বর্ষণে। ঝাপসা দৃষ্টি স্বচ্ছ হ'য়ে আসে একটু একটু করে। বিধ্বস্ত নাবিক তরণীর কাঠ্-টুকরো ধ'রে দীপ্ত আশায় হাত বাড়ায় আবার।

অশোকের বাবার এক ধনী বন্ধু ছুটে আসে এসময় তাদের

সাহায্যের জন্য। বন্ধুর এ ক্ষতিতে ব্যথিত হয়ে ওঠে তাঁর দয়াদ্র প্রাণ। ধীরে ধীরে আবার অশোক উঠে দাঁড়ায় মায়ের হাত ধ'রে।

ফিরে পায় সম্পত্তি। ব্যবসা টাকার জোরে আবার সচল হয়। তাদের মা-ছেলের সংসারে আবার ধীরে ধীরে হাসে সূর্য্যোদয়ের ঝল্‌মলে আলোরাশি।

অশোকের কাছে এ আলোরাশি একেবারে যে নিভে গিয়েছিল, তা নয়। যখন ঘন কালো অন্ধকার চারদিকে ঢেকে আসে, একটা ক্ষীণ অথচ অনির্ব্বাণ শিখার আশা-আলো তাকে পথ খোঁজার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। তা' কণিকার প্রেমময় সহানুভূতি।

তারই মতন সেও অনুভব করেছে সমান ব্যথা। তার সঙ্গে সেও ফেলেছে নীরবে চোখের অ-বাঁধ্‌ জল। ভেঙে পড়েনি। ভাগ্যের এ পট পরিবর্ত্তনকে সে যেন চ্যালেঞ্জ্‌ ব'লেই গ্রহণ ক'রলো। অশোককে দিল সান্ত্বনা: ছিঃ। তুমি না পুরুষ মানুষ? এইতেই ভেঙে পড়লে?

অশোক কথা বলেনি। শুধু কণিকার হাতখানা নিয়ে নিজের মুখ ঢেকে বসে ছিল স্তব্ধ হয়ে।

মাথায় হাত বোলায় কণিকা। বুঝতে পারে না এ বিষম অবস্থায় কি সান্ত্বনা দেবে তাকে,—তার প্রিয়তমকে!

এক সময় অশোক ব'লে ওঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলে: জানো কণি, কি ক্ষতি হল আমার? কতখানি নিঃস্ব আমি আজকে?

—কে বলে নিঃস্ব তুমি? আমি ত' রয়েছি কাছে তোমার। দেখ দেখি মুখ তুলে একবার?

ব্যথা ভরা মনটা আরও দুলে ওঠে অশোকের। কণিকা আশা দিয়ে বলে: না, না। তুমি অমন করে থেকোনা লক্ষীটি। দেখতো মার দিকে চেয়ে একবার। তুমি অমন করে থাকলে তিনি ত' আরও ভেঙে পড়বেন।

একদিন নয়। দিনের পর দিন এমনি করে সমব্যথী মন তার সব

ছেড়ে অশোকের পাশে পাশে ছিল একান্ত হ'য়ে। জানে, এ দুঃখে তার সঙ্গ লাভেই অশোক পায় একটু শান্তি।

অশোকের মাও জড়িয়ে ধরে তাকে কান্নার আবেগে: বল্ মা, কি পাপে আমাদের এ শাস্তি দিলেন ভগবান? কি ক'রে আবার দাঁড়াবে অশোক তোর?

চোখ দিয়ে একই ধারায় কণিকারও জল গড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দে। গলা জড়িয়ে বলে ওঠে সে: মা, তুমি তো রইলে আমাদের। তোমাকে ধরেই আবার উঠে দাঁড়াবে ও।

থামে না কান্না তখনও মার। বলেন: তুই ওর কাছে থাকিস্ মা। তোর বাবা যেন আশোককে তাঁর নিজের ছেলে ব'লে কাছে টেনে নেন। ওর যে আজ কেউ নেই।

হৃদয়খানা খান্ খান্ হ'য়ে যায় কণিকার এ কথায়। মানুষ যে অবস্থার চক্রান্তে কত অসহায় হ'য়ে ওঠে—তা দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে যায় সে। একি পরিণাম? একি দুঃসহ নির্দয় খেলা ভগবানের? তিনি ত' করুণাঘন, আনন্দময়। জগৎ তাঁর লীলা ক্ষেত্র। মানুষ তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি। তবু মানুষের বুকে এত কান্না কেন? কেন এত অসহায় সে?

* *

ভাবে কণিকা। এ ভাবনার তার শেষ নেই যেন। ক্ষুদ্র জীবন সবে সুরু তার তখন। সেই সময় অমন আঘাত কত যে তীব্র, ভাবলে শিউরে ওঠে তার অন্তরাত্মা। হায়! সেই ভাবনাও ত' কম দুঃস্বপ্নের নয়!

স্বপ্ন? সত্যি কি তাই? তবে তার আজ দুঃখ কেন এত? কেন এত পিষ্ট, ব্যথার করুণ মূর্চ্ছনায়? কতবার ভেবেছে—মিথ্যে সব। ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দুলে উঠেছে হাসির উচ্ছ্বাসে। তবু কেন চোখের পাতা সজল হয়ে ওঠে বারবার?

ভাবেনি। কল্পনাও করেনি। শুধু কণিকা নয়। তার বাবা-মা কেউই কখনও।

একি সম্ভব ? হা ভগবান !—ব'লে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে বাবা।

কান্নায় মুখ চাপা দিয়ে ডুক্‌রে উঠেছে মাওঃ ভাল হবেনা। ভগবান এতে অভিশাপ দেবেন। দেখে নিস্ কণি—জীবনে কিছুতেই ও শান্তি পাবে না।

কানে শুনে চম্‌কে উঠেছিল কণিকা। তারপর চোখের জল মুছে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল পাথরের মতন। কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে পারছিলো না ওদের কথা।

অশোক আসে না তারপর আর। শুধু তার মা এসেছিল কয়েক-দিন। ভনিতা নয়, বেশ সহজ ক'রেই ব'লেছিলেন সব কথা।

বাবা মা শুনেছিলেন নিঃশব্দে। একটিও কথা পেড়ে বাধা দেননি তাঁর কথায়। কণি কিন্তু সব শুনতে পারেনি। ছুটে পালিয়ে এসেছিল অন্ধকার ঘরটায়।

কখন রাত হয়েছে বুঝতে পারেনি। যখন সচেতন হ'ল, তখন দেখলো সমস্ত বাড়ীটা যেন একটা প্রেতপুরীর মতন নিঝ্‌ঝুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা বিরাট আঙুল সমস্ত মুখগুলোয় ঠেকিয়ে রেখে কে যেন ইঙ্গিতে বল্‌ছেঃ চুপ্। একদম্ চুপ্।

এত নিস্তব্ধ যে কণিকার শ্বাস প্রশ্বাস পর্য্যন্ত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কত রাত ঠিক বুঝতে পারে না। বাবা-মা কেউ তাকে ডাকেনি একবার ! সবাই সন্ত্রস্ত ছিল যেন কণিকার ঘুম না ভাঙে।

কিন্তু একসময় ঘুম ভাঙলো কণিকার। যেন একটা যুগ ধরে ঘুমিয়ে প'ড়েছিল সে। এমন ঘুম ঘুমোয়নি কখনও। কী গাঢ়—কী মধুরই না সে ঘুম। চোখের পাতা খোলা—অথচ গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন।

চোখের সামনে দিয়ে ভেসে ভেসে যাচ্ছিলো অশোকদের কাহিনী পট পরিবর্ত্তন ক'রে। কত সুখ দুঃখ নিয়ে, কান্না আর গান দিয়েই না গড়া সে সব কাহিনী। কতটুকু সময়ই বা? তবু কেমন গোছাল। কেমন সুন্দর।

অশোকদের সব বিপদ কেটে যায় একটু একটু ক'রে। বাবার বন্ধুর সাহায্যে সে আবার উঠে দাঁড়ায়। ফিরে পায় সব কিছু। তিনিই এখন ওদের অভিভাবক। সব কিছুতেই তাঁর মতামত প্রয়োজন হয়। মা বলেন: অশোক, এঁকে তোমার বাবার মতই ভাব্‌বে। এঁর মত না নিয়ে কখনও যেন কিছু কোর না। স্মরণ রেখো সেই দুর্দিনের কথা।

মায়ের পরম বাধ্য হয়ে ঘাড় হেঁট্‌ ক'রে অশোক। বলে: একি তুমি আবার বলে দেবে মা? তিনিই এখন আমার সব। আমি কথা দিচ্ছি কখনই কোন কাজ তাঁর অমতে হবে না।

শুধু কথা নয়, সত্যই তারপর থেকে কেবল সে কেন, তার মাও কোন কাজে হাত বাড়ায়নি তাঁর মত না নিয়ে।

সমস্ত বাড়ী, সমস্ত সম্পত্তি—ব্যবসার সবকিছুই এখন চলে অশোকের সেই জ্যাঠামশাইয়ের তত্ত্বাবধানে। বাড়ীর কর্ত্তা এখন তিনিই।

ভারী সুখী হয় অশোক। স্বস্তি পায় তার মা। কেটে যায় নির্ভয়ে পর পর তিনটে বছর।

মাত্র তিনটে বছর। যেন তিনটে দিন মনে হয় কণির। তবু দেখে এর মধ্যে কতই না পরিবর্ত্তন। যখন তখন আর অশোক আসে না তার কাছে। ডেকে পাঠায় না তার মা আর কণিকাকে। বাবার কাছে আসেন না তাঁরা আর পরামর্শের জন্যে। মাকেও ভুলে যায় সকলে।

ও-বাড়ী ক্রমশঃ পর-বাড়ী হ'য়ে ওঠে। ক্রমে ও বাড়ীর কাজ-কর্ম্মেও প্রায়ই ভুল হ'য়ে যায় কণিকাদের ব'লতে। অশোকও আর সময় পায় না কণিকার সঙ্গে একটু কথা ব'লতে।

কণিকা কিছু বোঝে। তবু ভুল ভাঙে না তার। নিজেই যায় আশোকদের বাড়ী। কিন্তু বাইরের-লোকের বেশী তেমন আর আদর পায় না।

ওপরে যায় মার কাছে। তিনি আর জড়িয়ে ধ'রে 'মা' বলে ডাকেন না। অশোকের ঘরে যায়। আসে অনেক কাছে। কিন্তু সেও আর উৎফুল্ল হ'য়ে হাত ধরে বসায় না। ডাকে না কাঁধের ওপর হাত রেখে আর আবেগের স্বরে 'কণি' বলে।

জোর করে কণিকা একদিন জিজ্ঞাসা করে: তোমার কি হ'য়েছে বল তো। ডাকলে সাড়া দাওনা। আসও না আর। আবার কাছে এলে যেন চিনতেও পার না। যেন....

সজল হয়ে ওঠে কথার সঙ্গে সঙ্গে কণির ডাগর চোখ দুটো। কেঁপে ওঠে গলাটা।

কথা বলে না অশোক। মাথা নীচু করে থাকে। হয়ত ভেবে পায় না ঠিক কি কথা ব'লবে তাকে। তাই নিঃশব্দে সেখান থেকে স'রে যায় এক সময় অন্যত্র।

* *

হঠাৎ একদিন এমনি এক সন্ধ্যায় কণিকা এসে দেখতে পায় এক অপরিচিতাকে অশোকদের বাড়ী। তারই মতন দেখতে। তবে বয়স একটু বেশী এই যা।

অশোকের মা হেসে বলে: ওহো কণি! ভুলেই গেস্‌লুম তোমায় ব'লতো এর কথা। এ হ'চ্ছে আমাদের সুচেতা। অশোকের বাবার বন্ধু—এই যে আমাদের জ্যাঠামশাই, সুচেতা হ'চ্ছে তাঁরই একমাত্র মেয়ে। এ বছর আই. এ. দিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছে। নাচ গান সব দিকেই এক্স্‌পার্ট। ভারি ভালো মেয়ে। অশোকের ভারী ভাল লেগেছে একে।

কণিকা তাকিয়ে দেখে সুচেতার দিকে। বোঝে ভাল লাগবার কারণ নিশ্চয়ই আছে সুচেতার দেহে। সহজেই পুরুষ মানুষের চোখ দীপ্ত হ'য়ে ওঠে তার গঠন আর লাবণ্যে। অশোকেরও যে ভাল লাগবে, এতে আর দোষ কি ?

কণিকা হাসে সহজ ভাবে মার মুখে প্রশংসা শুনে। আলাপও ক'রতে যায় সুচেতার সঙ্গে। কিন্তু অপর পক্ষের কাছ থেকে তেমন সাড়া পায় না। হাত ধরতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। দেখে আঁচলটা দুলিয়ে সুচেতা উঠে গেল ওপরে।

অশোকও বলে ঃ হ্যাঁ, কণি। সুচেতা বড় ভাল মেয়ে। মার ত' ওকে খুব-ভাল লেগেছে। ভারী ইচ্ছে অমন মেয়েকে আঁচলে বেঁধে রাখেন। তা'ছাড়া শুনেছ নিশ্চয়ই, জ্যাঠামশায়ের ঐ একমাত্র সন্তান। বিরাট সম্পত্তির একক মালিক। খুব 'জলি' কিন্তু মেয়েটা।

ভুরু কোঁচ্‌কায় কণিকা অশোকের কথায়। একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে ওঠে ঠোঁটের কোণে তার। জিজ্ঞাসা করে ঃ তাই নাকি ? তুমি তাহ'লে ওর সঙ্গ পেয়ে খুব 'হ্যাপী' বল ? তা আমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিলে না কেন ?

—কী জানো, অশোক বলে আমতা আমতা করে, ঃ ও বড় 'সেন্টিমেণ্টাল্'। ত'াছাড়া, ঠিক যার-তার সঙ্গে মেলা-মেশা করা ওদের 'এটিকেটে' বাধে।

কথা আর যোগায় না এরপর কণিকার মুখে একটিও। শুধু একটি শান্ত করুণ ভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকে অশোকের নত মুখটার দিকে এক-দৃষ্টিতে। কয়েকটা মুহূর্ত্ত কেটে যায়। তারপর কণিকা একসময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় নিঃশব্দে।

বাইরের আকাশে তখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। কণিকা নিজের ঘরে ফিরে এসে দাঁড়ায় সেই বড় আরসিটার সামনে। আপাদমস্তক্ কি যেন একবার লক্ষ্য করে নিস্পলক দৃষ্টিতে। তারপর খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ফাটিয়ে ফেলে সমস্ত ঘরখানা।

'যার-তার সঙ্গে'—কথাটা তখনও তার সারা দেহের রক্ত স্রোতের সঙ্গে দুলে দুলে বেড়ায়। সত্যই তো তার কি বা আছে? তার বাবা সামান্য একজন কেরাণী। একখানা ভাঙ্গা একতলা বাড়ী। আর সেভিং এ্যাকাউণ্টের গোটা কতক টাকা। এই সম্বল মাত্র। এই নিয়ে সে কোন্ ভরসায় এগিয়ে গিয়েছিল ওদের সঙ্গে মিশতে? টাকার পরিমানেই ওদের সব কিছুর হিসাব চলে। 'নোট্' দিয়েই ওরা যে মানুষের হৃদয়ের প্রেম প্রীতি ভালবাসা নোট্ করে;—ভুলে গিয়েছিল কণিকা সে কথা।

সেই অশোক? পোড়া মন এখনও কেন ভোলেনা তাকে? এক দিন যাকে 'বড়লোক' বললে, টাকার কথা তুললে রেগে উঠতো। কথা শেষ হয়ে গেলেও নূতন করে কথা বানিয়ে আটকে রাখত। চ'লে আসতে চাইলে হাত ধরে বলত: আর একটু বোস না।

—আমার আর বুঝি কাজ নেই?

শুনতো না অশোক। আরও জোর করে কণিকাকে ধরে ব'লত: ছাই! ভারী ত' কাজ। কেবল ছল্ ক'রে পালাতে চাও। আচ্ছা কণি, আমার কাছে তোমার এত লজ্জা কেন বলত?

কণিকা আর উঠ্‌ত না। অশোকের শক্ত হাতখানার ওপর নিজের নরম হাতটা রেখে চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রত: আমায় পেলে খুব খুশী হও, না?

—তুমি কি হওনা?

—কিন্তু আমায় যদি জীবনে না পাও। যদি হারিয়ে যাই তোমার কাছ থেকে?

হঠাৎ কণির এ কথায় চমকে উঠেছিল সেদিন অশোক। রেগেও গিয়েছিল ভীষণ। কণিকা কিন্তু খুব হেসে উঠেছিল ওর আচরণে। বলেছিল: তুমি ভারী 'সেন্টিমেণ্টাল্'। একটা রহস্যও বুঝতে পার না। আমি কি সত্যি হারিয়ে গেছি?

তবু অশোক অনেকক্ষণ কথা বলেনি। জানলার ধারে গিয়ে চুপ

করে দাঁড়িয়েছিল অন্ধকারে। তারপর যখন ফিরে তাকায় ওর দিকে, কণিকা দেখে সজল ছুটো ধারা চিক্ চিক্ ক'রছে ওর মুখে।

অশোক যে এত নার্ভাস, বুঝতে পারেনি কণিকা। কাছে গিয়ে আঁচল দিয়ে জল মুছিয়ে দিতে তারও চোখের পাতাগুলো সেদিন ভিজে গিয়েছিল। বুঝেছিল, সত্যি অন্যায় হ'য়ে গেছে তার। আবেগের স্বরে বলেছিল : রাগ কোরনা লক্ষীটি। আমি রহস্য করছিলুম শুধু। তোমায় ছেড়ে একটা মুহূর্ত্তও আমি থাকতে পারব না। হারাবার ইচ্ছে থাকলেও তোমার জন্যে হারাতে পারবো না জেনো।

তবু মরতে মরতে একদিন হারিয়ে গেল কণিকা। দুর্ভাগ্য যে এত শীঘ্র তাদের মধ্যে চরম বিচ্ছেদ আনবে কে জান্‌তো? সেই অশোকই দু' হাতে একদিন যেন গলা টিপে মেরে ফেললো কণিকাকে নিঃশব্দে। একটা চাপা আর্ত্তনাদও কেউ শুনতে পেল না। জান্‌তে পারলো না কী নৃশংসয়, কী নিষ্ঠুর সেই হত্যা।

শাঁখের পর শাঁখ বাজলো। একসঙ্গে অনেকগুলো। নহবৎ এর বাজনায় ছড়িয়ে প'ড়লো কত সুর কত দিকে। আলোর মালায় ঝল্-মলিয়ে ওঠে তিনতলা নূতন বাড়ীটা। গাড়ীর পর গাড়ী—লোকজন, আত্মীয়-স্বজন। সমস্ত দিন রাত্তির ধ'রে সে কী উচ্ছল্ আনন্দ।

অশোকের বিয়ে হ'য়ে গেল। গর্বে ভরে উঠল তার মা'র মন, জ্যাঠা-মশায়ের বুক। সকলেই স্বীকার করল : খাসা হয়েছে। যেমন বর, তেমনি কনে। যেন হর-পার্ব্বতী। দু'দিন ধরে উৎসবের খানা খেল সমস্ত গ্রাম জুড়ে লোকেরা। বাহবায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো দিগ্বদিক।

ফুল-শয্যার দিন সারা রাত ধ'রে বাজী পুড়ল হাজার টাকার। ভাড়া করা ইংরাজি বাজনার ঝনৎকার—আর বড় বড় আর্টিষ্টদের মনোরম জলসায় মুখর হয়ে উঠলো ধনী অশোক রায়ের বাড়ী। রক্তগোলাপের কুঁড়ি দিয়ে তৈরী হয়েছে ময়ূরপঙ্খী পালঙ্ক। অশোকের বড় প্রিয় এই রক্তগোলাপের আধ্‌ফোটা কুঁড়ি।

নহবতের বাজনা কাণিকার কানেও এসেছিল। রক্তগোলাপের

কুঁড়িগুলোর গন্ধও বাতাস বয়ে এনেছিল তার কাছে। ছাদের অন্ধকার কোণটায় দাঁড়িয়ে সমস্ত রাত সে একলা কাটিয়ে দিয়েছিল সেদিন।

নিমন্ত্রণের একখানা কার্ড তার কাছেও এসেছিল। সোনার জলে লেখা—শ্রীমান অশোকের সহিত শ্রীমতী সুচেতার······। সবটা পড়তে পারেনি স্পষ্ট ভাবে কণিকা। এক রাশ জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল তার দৃষ্টিশক্তি।

তার মা বাবাকে অশোকের এক মামা এসে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলেন। অপূর্ব্ব সৌজন্য দেখে বাবার মুখে ফুটে ওঠে এক আশ্চর্য্য হাসি। মাও হেসেছিলেন : তা বেশ। তাতে কি হ'য়েছে বাবা? অশোকের মা কাজে ব্যস্ত। তার কি আসবার সময় আছে? নিশ্চই যাব আমরা। অশোকের বিয়ে····এ তো আনন্দের········

সব কথা শোনার প্রয়োজনীয়তা আছে ব'লে মনে করেননি অশোকের মামা। হাসতে হাসতে মাথা দুলিয়ে দরজা থেকেই ফিরে এলেন।

কণি জানলা দিয়ে সে দৃশ্য দেখে ধীরে ধীরে উঠে এসেছিল ওপরের ঘরে। পাথর সে হয়নি। তবু বুঝতে পেরেছিল, তার হৃদ্‌স্পন্দনের বেগটা যেন হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন। হারিয়ে ফেলেছিল চেতন মনের সকল চলচ্ছক্তি।

অশোক নেই। তার 'কণি'ও হারিয়ে গেছে। সুচেতাই তাকে নিয়ে সরে গেছে। পালিয়ে গেছে। পালানো ছাড়া আর কি? হয় তো অশোকই তাকে বলেছিল। অথবা সুচেতারই ভয় হয়েছিল। যদি কণিকা আবার বেঁচে ওঠে! আর যদি নাইবা বাঁচে, মানুষের প্রেতাত্মাও তো কম ভয়ের নয়?

তাই ঠিক। কণিকার প্রেতাত্মাকেই তার বড্ড ভয় হ'য়েছিল। বিয়ের দিন-সাতেক পরেই এখানকার সব পাট চুকিয়ে তারা চ'লে গেল অনেক দূরে। কণিকার নাগালের বাইরে। যেন অশোকের ছায়াটি পর্য্যন্ত কণিকা আর দেখতে না পায়।

কণি মরে গেছে। সত্যই সে এখন অশরীরী। তার নিজেরই এখন ভয় হয় তাকে। আরসির সামনে দাঁড়িয়ে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে। একা বকে যায় কত সময়। কত অসংলগ্ন কথা। যেন নাটকের কোন স্বগতোক্তি আবৃত্তি ক'রে চলে অনর্গল।

শুধু কি তারই ভয়? তার বাবা মাও তার ভয়ে সদাই সন্ত্রস্ত। মা কেঁদে বলে বাবাকে ঃ কী হবে ওর? কি করে ওর মুখে আবার হাসি ফুটবে? ওর ভবিষ্যৎ কি অন্ধকার হ'য়ে যাবে?

বাবা জবাব দেয় না। তিনিও যেন একটি নাটকের নীরব পার্ট অভিনয় ক'রে যাচ্ছেন সুন্দর ভাবে। মাঝে মাঝে হাসেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। আবার বেরিয়ে যান নিজের কাজে।

সমস্ত বাড়ীটাও যেন কেমন হয়ে গেছে তাদের। এত আলো, এত বাতাস, তবু মনে হয় সব দিকটা ঘন আঁধার, গুমোট করা বদ্ধ বাতাস। দম নিতে কষ্ট হয় কণিকার। নিজের অত গোছালো স্বভাবও যেন কেমন হয়ে গেছে অবিন্যস্ত। কথা ব'লতে বেজার ধরে কারুর সংগে। হাসতে তো ভুলেই গেছে সে। শক্ত সবল দেহটা হাওয়ার মত হাল্কা লাগে। অসুখ নয়। তবু কেমন যেন একটা যন্ত্রণা অনুভব করে সমস্ত দেহ-মনে।

সারা সন্ধ্যে ধরে কণিকা ঘুরে বেড়ায় ছাদের কোণে কোণে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে এদিক ওদিক। চাঁদ দেখ্‌লে মুখ ফিরিয়ে নেয় অন্যদিকে। মাঝে মাঝে কী যেন লক্ষ্য করে দূরের ঐ বাড়ীটার চিল্‌-ছাদের দিকে।

কী যেন হারিয়ে গেছে তার। অনেক আদরের জিনিষ। জানে খুঁজে পাবেনা কোনদিন। তবে এই খোঁজাই যেন নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। নিজে সে হারিয়ে ফেলেনি। জোর ক'রে একটা দৈত্য এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তার কাছ থেকে। কোন বাধা সে শোনেনি। এতটুকু দয়া হয়নি তার অশেষ কান্নায়।

* * *

দেখতে দেখতে তারপর কেটে যায় ছ' ছটা মাস। হঠাৎ ওঠা দম্‌কা ঝড়ো-হাওয়া থেমে আসে এক সময়। ভাবলেই মনে হয় কত বড় বিপদই না ছিল সেটা। এরপর বেঁচে থাকাই যেন বঞ্চনা।

কিন্তু ক্রমশঃ সবই আবার স্থির হ'য়ে আসে। পদ্মা আবার তার পুরানো রূপে শান্ত হয়ে বইতে সুরু করে কুল্ কুল্ ক'রে। পাল তুলে আবার মাঝি গান ধরে তার বুকে নৌকো বেয়ে'। মেয়েরা ঘড়া নিয়ে নিশ্চিন্তে স্নান করতে নামে যে যার ঘাটে। সাঁতার দেয় ছেলের দল আবার জটলা ক'রে।

কণিকা আবার খোলে বইয়ের পাতা। দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে চলে তার কলেজের পড়া। বাবা, মা আবার সহজ হয়ে মেয়ের পাত্র খোঁজেন। ভুলে যায় অশোকের কথা সবাই। কোন দিন ঐ নামে কেউ এসেছিল কণিকার জীবনে, বিস্মৃত হয় সে। ওদের কোন কথাই আর আলোচনা হয় না তাদের বাড়ীতে।

ছোট্ট সংসারটা তো বেশ চলছিল ঢিমে তালে। ছোট্ট হাসি একটু কান্না। তেমন বিশেষ কিছুই নয়। তাদের নিজেদের মধ্যেও এমন কিছু ঘটল না। ক্ষতিও তাদের এমন কি হয়েছে আর।

অশোকদের সাথে পাল্লা নাইবা দিতে পারল তারা। ক্ষতি কি? আশার জাল সবাই তো বোনে। রঙীন্ স্বপ্ন নিয়ে সবাই তো জেগে থাকে। কিন্তু একেবারে নিঃসংশয় যে হতেই হবে—এ কেমন ধারা? তা'হলে আর সংসারে দুঃখ জ্বালার মূল্য কি?

অশোককে তাই ভুলতে হয় তাদেরও। স্মৃতি এসে মাঝে মাঝে কারণে অকারণে সজল ক'রে তোলে চোখের পাতা কণিকার। সহস্র কথা পুরানো হ'য়ে গেলেও কিছুতেই মলিন হয় না তার কাছে। তবু উপায় কি? না ভুলে মন ভোলাবার পথই বা কোথায়?

মন ভোলায় কণিকা নূতন উদ্যমে শত কাজের বোঝা মনের ওপর

চাপিয়ে। পড়াশুনোয় তাই আবার সজাগ হয়ে ওঠে। আবার মাতে খেলা-ধুলায়। গান বাজনার চর্চ্চা ক'রে বে-সুর রাগিনীকে নূতন সুরে বাঁধতে।

ঘন ঘন বাবাও আজকাল খোঁজ করেন তার লেখাপড়ার। অফিস থেকে এসে বাইরে যান না। মেয়ের পাশে বসে নিজেরও সময় কাটান বই প'ড়ে। মাঝে মাঝে বই রেখে জিজ্ঞাসা করেন ঃ কেমন হ'চ্ছেরে পড়া ? এগুচ্ছে তো ? তোদের ইংরেজির প্রফেসর আজ কোন্ লেকচার দিলেন ? নোট করে নিয়েছিস্ তো সব ?

কণিকা ঘাড় নাড়ে। জানায় নোট করে নিয়েছে। বলে ঃ আজ আমাদের টেনিসনের "ইউলিসিস্" আরম্ভ হয়েছে। গল্পটা কি সুন্দরই না লাগছিল বাবা। সত্যি ইউলিসিস্ একটা আদর্শ পুরুষই বটে, তাই না ?

—তোর ভাল লাগে এমনি একটি লোককে ?

—নিশ্চয়ই বাবা। কী দৃঢ়চেতা, এম্বিসিয়াস-ম্যান্ বল তো। জীবনটা যে কি বস্তু—মনে হয় একমাত্র সেই উপলব্ধি করেছে।

—আমিও তাই ভাবি রে। বাবা কণির উৎসাহ ভরা মুখটার দিকে তাকান। এম্বিশান থাকে সকলের। কিন্তু এমন ক'রে তাকে রূপ দেবার চেষ্টা ক'জনাই বা করে বলতো ? তোর মনে পড়্ছে সেই লাইনটা ? ওই যে—'I will drink life to the lees.' বলতো মা ক'জনা এমন কথা বলতে পারে বুক ফুলিয়ে ?

কণিকা অভিভূত হয়ে যায় এ আলোচনায়। বাবার কথাগুলো যেন হাঁ করে গিলে খায়।

—তা' ছাড়া ঐ লাইনটাও কত সুন্দর!—একটানা কথার মধ্যে কোথাও থামেন না তিনি ; ওই যে রে ঃ To strive, to seek, to find and not to yield.

—শুনেছি লাইনগুলো। এখনও সব শেষ হয়নি আমাদের।

—ওহো ! আচ্ছা তোর পড়া শেষ হোক। তারপর আমি

তোকে নিজে আবার সবটা পড়াব। ভারী ভাল লাগে এ কবিতাটা আমার।

কণির কৌতূহল জাগে। বলে : তোমাদের এ-পিস্‌টা ছিল বুঝি ?

—না। প্রাইভেটে বি. এ. দেবার সময় থেকে ইংরাজি সাহিত্য নিয়ে কিছুদিন পড়াশুনো চালিয়েছিলুম। টেনিসন্‌ আমার খুব ভাল লাগে।

মার কাছে কণিকা বাবার অনেক কথাই শুনেছে। সাধারণ ঘরের একজন লোক ছিলেন বাবা। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছিলেন অনেক কষ্টে। স্কুল ছেড়েই তাকে বেরুতে হয় কাজের খোঁজে।

দিনে রাতে টিউশনি আর গ্রামের স্কুলের একটা সামান্য চাকুরী ক'রে সংসার চালাতেন প্রথমে। কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে লেখাপড়া চর্চ্চা থামান নি কখনোও। ভারী ইচ্ছে ছিল তাঁর, কলেজে পড়বেন । কিন্তু সেটা স্বপ্নই থেকে যায়। সুযোগ হলেও সংসারের জন্য পড়বার সুবিধা পান নি। প্রাইভেটেই ক্রমে ক্রমে বি. এ. পর্য্যন্ত পড়েছিলেন। তবে বই পড়া তাঁর কখনও থামেনি।

কণিকাও দেখেছে বাবার বইয়ের ছোট্ট আলমারিটা। বাংলা বই—বঙ্কিম, শরৎ, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ থেকে ইংরাজি শেক্সপীয়ার-টেনিশন-শেলী-কীটস্‌—কতই না সুন্দর একটা সংগ্রহ। অবসরের বড় প্রিয় বন্ধু ছিল এরা বাবার।

সে নিজের চোখেও ত দেখেছে। ছুটির সময় একটু-আধটু ঘুরে বেড়ানো, আর এই আলমারির সংলগ্ন টেবিলে সময় কাটানো—বাবার আরামের ছিল পরম উৎস।

মা ছিলেন এক স্কুল মাষ্টারের মেয়ে। লেখাপড়া স্কুলে বিশেষ শেখেননি। কিন্তু বাড়িতে পড়েছিলেন বাবার কাছে অনেক কিছু। ভারী ভক্ত ছিলেন রামায়ণ-মহাভারতের। অবসর পেলেই খুলে বসতেন রামায়ণের নানা কাণ্ডের পাতা।

গল্প বলতেও পারতেন ভারী সুন্দর। সব ঘটনাই এমন মুখস্থ ছিল যে—প্রসঙ্গ উঠলেই হ'ল একবার। কত সন্ধ্যে কণিকা কাটিয়েছে মার সংগে সেই সব গল্প শুনে। মার বড় প্রিয় ছিল সীতার বনবাস-কাহিনী। পড়তে পড়তে দু'চোখ বেয়ে নামতো জলের ধারা। কণিকারও চোখ দুটো সজল হয়ে উঠতো অন্ধকারে।

—হ্যাঁ মা, সীতা খুব পতি-প্রাণা ছিল, না?

পড়তে পড়তে মা থামলে কণিকা জিজ্ঞাসা করে এক সময়।

—আদর্শ স্ত্রী ছিল বটে সীতা। রাজনন্দিনী, রাজ-বধূ হয়েও জন্ম-দুঃখিনী।

—কিন্তু মা, রামচন্দ্র কি ঐ ভাবে বনবাস দিয়ে ভাল কাজ ক'রেছিলেন? কি পাপে সীতাকে তিনি অমন নিষ্ঠুর ভাবে ত্যাগ করেছিলেন?

—একে নিষ্ঠুর কেন বলছিস্ কণি?

—নিষ্ঠুরই তো মা। তিনি কি জানতেন না সীতা অপাপা? কৈ অত দুঃখে সীতা তো কোনদিন স্বামীকে দোষারোপ করে নি।

—তাই তো সীতা সাধ্বী স্ত্রী, কণি।

এবার হেসে ফেলে কণিকা মার কথায়। বলে: মেয়েদের জীবনে এই খানেই মুশকিল্ মা। তার ধর্ম্ম শুধু স্বামীর আদেশ মানা। স্বামীর ইচ্ছার স্বমত হওয়া। তা' স্বামী যত অন্যায়ই করুন। কি বল?

মা সহসা উত্তর দেয় না কণির কথায়। কণিও এরপর কেমন যেন আন্‌মনা হয়ে যায়। ভাবে সীতার দুঃখ কি তারও দুঃখ নয়? কোন্ পাপে অশোক তাকে অমন ছলনা ক'রল? কী দোষ ক'রেছিল সে? কোন্ ইচ্ছায় সে তার সংগে প্রতারণা করেছিল?

রাময়ণের কাহিনী আবার প'ড়ে চলে মা সুর ক'রে। কিন্তু কণিকা আর কাছে গিয়ে বসে না। ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে যায় অন্যত্র।

মাকে তার কতই না ভাল লাগে। সংসারের কোন অভাব অভিযোগে কখনও তিনি ব্যস্ত হতেন না। আপন মনের মাধুর্য দিয়ে সব কিছুকেই ভরে তুলতেন মধুর ক'রে।

বাবার সংগে তার কোনদিন ঘটত না কোন মনমালিন্য। মতান্তর হলেও মানিয়ে নিতেন মিষ্টি ব্যবহারে। সকল দায়িত্বই তুলে নিয়েছিলেন নিজের ঘাড়ে। আত্মীয়-স্বজন চাকর-বাকর সকলকেই বেঁধে রাখতেন তার মধুর ব্যবহারে।

কণিকাকেও ব'লতেন কত সময়ে ঃ দেখ্ মা, পৃথিবীতে এই একটি জিনিষ আছে, যা দিয়ে সব্বাইকে জয় করা যায়। যে যাই বলুক, কখনও নিজের মিষ্টি ব্যবহারকে ত্যাগ করিসনি। কারুর সংগে ছল্-চাতুরি করবি না। দেখবি, ভগবান তোর সহায় হবেন। শত্রু তোর মিত্র হবে।

—তা বলে অন্যায়কেও মেনে নেব ?

তর্ক নয়। এমনি কথার পিঠে জিজ্ঞাসা করে কণিকা।

মা আরও মিষ্টি করে বলতেন ঃ জগতে কিছু অন্যায় নেই মা। আমাদের নিজের বিচার বুদ্ধির তারতম্যেই ন্যায়-অন্যায় মাপ করি। মঙ্গলময় ভগবানের সংসার-লীলায় সবই ন্যায়, সবই মঙ্গল মা।

বুঝেও বুঝতে পারে না কণিকা মার কথা। তবু শ্রদ্ধা করে। ভক্তি ভাবে শোনে সব কথা। চেষ্টাও করে মার কথা মেনে চলতে।

আশ্চর্য সহ্য শক্তি ছিল তার মার। সহজে কোন কিছুতেই বিচলিত হতেন না তিনি। আনন্দে দুলে উঠতেন—কিন্তু উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়তেন না। জীবনে আঘাত পেয়েছেন কম নয়। তাঁর নিজের মুখেই শুনেছে সে সব কথা কণিকা।

জন্ম হ'য়েই মাকে হারায়। বিতৃষ্ণায় আত্মীয়-স্বজন মানুষ ক'রে তোলে। তাঁর বাবার দৈন্য চিরকালই ছিল। প্রথম জীবনে কাজ ক'রতেন জমিদারী সেরেস্তায়। কোনদিন একটু ভাল খাবার, একখানা ভাল কাপড় পান নি তাঁরা।

দুচক্ষে দেখতেও পারতেন না তিনি মাকে। বলতেন, ও রাক্ষসী ; ও এল, আর ঘরের লক্ষ্মী চলে গেল। কোনদিন ছোটবেলায় আদর করেন নি। নিতান্ত অবহেলায় কেটে যায় শৈশবের দিনগুলো। তবে বিয়ের পর সব দুঃখ কষ্ট ভুলেছিলেন। কণিকাকে সব সুখ দিয়ে মানুষ করে তুলতে তাই তাঁর এত আগ্রহ।

যে বাড়ীটায় তারা থাকে, খুব বড় নয়। কণিকার জন্ম এই খানেই হয়। বাবার মুখে সে শুনেছে তাদের সে সব কথা।

* * *

এপাড়ায় তখন কটাই বা ঘর। গংগার ধারের এ পূব অঞ্চলটা তখনও শহর থেকে অনেক দূরে। এক অখ্যাত অঞ্চল। রেলগাড়ির লাইন তখন সবে পাতা হচ্ছিল এর দু-তিন ক্রোশ দূর দিয়ে।

মাঠে ঘেরা নয়। বনে-জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এর চারিদিকটা। মধ্যে মধ্যে দু' একটা মাটির ঘর। গ্রাম বলা চলে না। একটা এঁদো পল্লী-পাড়া। লোক সংখ্যা দশ আঙুলে গোণা যায়। কাজকর্ম্ম, যা হ'ত সব গংগার ওপরেই।

যে কটা ঘর, সবকটারই ছিল এক একখানা ডিঙ্গি নৌকা। মাছ ধরা আর ওপারের হাটবারে তারই ব্যবসা করা—এই ছিল তাদের পয়সা উপায়ের একটা প্রধান পথ। রাণী রাসমনির কৃপায় গঙ্গার এ ভাগটায় মাছ ধরার অবাধ স্বাধীনতা ছিল তাদের। ইলিশ্ মাছের মওড়ার সময় মাঝে মাঝে লোভে প'ড়ে টাকি-জেলেরা হানা দিত দল বেঁধে। বর্গীর দল যেন ছিল এরা। হঠাৎ কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নৌকা আসতো কালো রাতে—দু'তিন দিন ধরে সারা গংগা জুড়ে জাল বেঁধে আটকে দিতো হাজার হাজার মাছের উজান গতি। তারপর যে যার নৌকা বোঝাই দিয়ে সরে পড়ত নিঃশব্দে।

স্থানীয় জেলেরা সংখ্যায় নগণ্য। বাধা দিতে পারতো না সহসা। দল বাঁধতে বাঁধতেই চম্পট দিত শত্রুর দল।

আগে থেকে বুঝতে পেরে তৈরী হ'য়েও থাকতো অনেক সময়। গুপটি মেরে বসে থাকে চড়ার মুখে দড়ির ফাঁদ পেতে। হাতে থাকতো সড়কি, লাঠি আর বাঁকা রাম-দা। হঠাৎ রাতে হৈ হৈ রবে বেরিয়ে পড়তো লুকোন জায়গা থেকে। ফুলে উঠতো নদীর জল কয়েকশ' ডিঙ্গির ধাক্কায়! এপার ওপার থেকে তাড়া দিয়ে ঘেরাও ক'রত পালাবার পথ।

যারা আসতো মাছ চুরি ক'রতে তারাও কেউ নিরস্ত্র হ'য়ে আসতো না। জান্ কবুল ক'রে লাঠি চালাত। সড়কি হাঁকাত দূর পাল্লার। অনেকটা জায়গা জুড়ে ঘোলা গংগার জল টাট্‌কা খুনে রঙীন হ'য়ে উঠতো। চাপা পড়তো বুকফাটা আর্ত্তনাদ হল্লার মার্ মার্ রবে।

মাঝে মাঝে শত্রুর দল পালিয়ে যেতো রণে ভঙ্গ দিয়ে। আবার সময় সময় জয়ধ্বনি তুলে ঢুকে পড়ত অনেক ভেতরে। কাছে ডিঙ্গি বেঁধে প্রতিশোধ নিতে হামালা বাধাত কাছাকাছি পড়শীর ঘর গুলোয়। ছোট খাট যুদ্ধ হয়ে যেতো প্রায়ই। কোন দল হাসত তৃপ্তিতে। কোন দল তপ্ত করে তুলতো বাতাসটা আর্ত্তনাদে।

এদান্তি আর ঘটেনা এসব নৃশংসতা। রেলগাড়ীর চল্ হওয়ায় ক্রমশ এদিক ওদিক থেকে বাসিন্দা আসে। ঘর-বসতি বাড়তে থাকে। বন জঙ্গল সাফ হ'য়ে স্থরু হয় চাষ আবাদ। ছোট্ট একটা হাটও বসে পাড়া-ঘরে। লোকজন বাড়ার সংগে সংগে গ্রাম-জীবনের সমস্যাও রূপ নেয় নিত্য নূতন। শহরে মাল চালান চলে। সম্পর্ক ঘনীভূত হয় শহর আর গ্রামের। বড় সড়কও একটা বাঁধা হয় রেল-লাইনের পশ্চিম দিক ঘেঁসে। স্থরু হয় যান-বাহন চলাচলের।

কয়েকটা বছর। হাত দিয়ে গোনা যায়। দেখতে দেখতে সাড়া পড়ে যায় সারা অঞ্চলটায়। কণির বাবার পূর্বপুরুষদের অনেক জমি নিয়ে এইখানেই ছিল একটা ফসলের বাগান। মাঝে মাঝে আসতেন

তাঁরা। সংসারের মতন খোরাক তুলে নিয়ে, বাকি ফল ফসল নৌকা বোঝাই দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন গঞ্জের ঘাটে।

পর পর তিন পুরুষ ধরে এই ভাবেই চলে আসছিল তাদের ব্যবস্থা। হঠাৎ কণির ঠাকুরদার বাবার আমল থেকেই লোপ পায় এ সব। জমিদারের সংগে বিবাদ ক'রে একজন ইংরাজ সওদাগরকে বিক্রী করে দেয় জমির একটা মোটা অংশ।

একেবারে গংগার ধারেই এমন বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা পেয়ে আর একটুও কালক্ষয় করে না বিদেশী বণিক। দেখতে দেখতে গড়ে ওঠে বড় বড় পাটের কারখানা। কাপড়ের কল্ বসে পর পর কয়েকটা। কাছেই কলকাতা বন্দর। জাহাজে মাল চালান দেওয়ারও সুবিধেটা কম নয়।

জোয়ারের জলের মতনই যেন ভেসে আসে দলে দলে লোক সেই কল-কারখানায় কাজের আশায়। স্থানীয় লোকেরাও অন্য ব্যবসা ছেড়ে কাঁচা-পয়সার বাঁধা-মজুরী পাবার আশায় জমা হলো কলের গেটে।

দশটা ঘর নিয়ে ঝিমিয়ে ছিল যে অঞ্চলটা এতদিন—যন্ত্রদানবের হুঙ্কারে সজাগ হয়ে উঠলো সে যেন। ছোট্ট ডিঙ্গির ছল্-ছলাৎ গানে যে গংগা বয়ে চলছিলো ঢিমে তালে একদিন, বড় বড় জাহাজ আর গাধাবোটের অহরহ ঝপাং ঝপাং শব্দে যেন রোষে ফুলে ফুলে উঠলো। খড়ের-চাল পাল্টে গেল। শহরের মত তৈরী হতে লাগল পাকা দালান-বাড়ী। কাঁচা রাস্তার ওপর পীচ পড়লো যানবাহনের চলাচলের সহজ সুবিধের জন্যে।

মানুষও পালটে গেল। পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনেরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে দ্রুততালে। এক ঘরের গুটিকয় মানুষ এখন নানা জাতের মিশ্রণে হয়েছে বিচিত্র।

আরও পরে বিজলী বাতি এল। শহর থেকে লাইন টেনে বসলো ধীরে ধীরে টেলিগ্রাফ—টেলিফোন। রাতের ঘুটে ঘুটে ভয়-ধরা গ্রামে আর রইল না আঁধার এতটুকু। দেশের চারিদিকের সঙ্গে স্থাপন

হ'ল তার সম্পর্ক। নয়া শহর গড়ে উঠল একটা যুগের কটা মাত্র বছরের মধ্যে।

এ শহরের জন্ম-সুরুতে কণির ঠাকুর্দ্দাও ফিরে এল নিজের জমিতে নতুন ক'রে ঘর বাঁধতে। এখন আর নিজের ভিটে ছেড়ে দূর শহরে থেকে লাভ কি ? কণির বাবা তখন মাত্র চার বছরের ছেলে। টালির সেড্ দেওয়া দুখানা ঘর, আর সামনে খানিকটা বারান্দা। এই ছিল তাদের বসতবাটি।

সে সব কথা এখনও মনে আছে কণির বাবার। কণির ঠাকুর্দ্দা করতেন তেজারতি কারবার। ছেলেকে নিয়ে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতেন সারা নয়া শহরটায়। নিত্যকার পরিবর্ত্তনে কতই না রং বদল দেখতেন তিনি। মিশতেন কতলোকের সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ ভাগ্যও তাদের পালটে গেল একদিন। মারা গেল কণির ঠাকুর্দ্দা দু'দিনের কালাজ্বরে। নাবালক ছেলের হাত ধরে বিধবা-মা আর ঠাকুরমা ভাসলেন অথৈ জলে।

দিন যায়। অতি কষ্টে মুড়ি ভেজে, দুধ বেচে সংসার চলে তাদের। কোনরকমে পাঠশালায় পাঠ শেষ ক'রে ছেলে ঢোকে স্কুলে বৃত্তির জোরে।

দ্রুততালে নয়া শহর এগিয়ে চলেছে। 'পাশ' দিয়েই কণির বাবা একটা চাকরী পেয়ে যায়। ভগবান এবার যেন একটু মুখ তুলে চান দুঃস্থ সংসারটার দিকে। ছোট টালির বাড়ী ধীরে ধীরে রূপ পালটায়। তৈরী হয় কোঠা বাড়ী।

আনন্দের দোলা লাগে মা ঠাকুমার আশাভরা বুকটায়। ঘটা ক'রে ভাল ঘর দেখে বিয়ে দেন ছেলের। ভাঙা সংসারে সুখের জোয়ার আসে কলকল্লোলে। কিন্তু তারই মধ্যে দুপাশ থেকে ডুবে যায় দুটি কূল নিঃশব্দে। যাদের দীপশিখার আলোয় নূতন ক'রে জীবনের মশাল জ্বালালো কণির বাবা, সেই মা-ঠাকুমা পর পর স'রে গেল একসময়।

পৃথিবীটা গোল। কিন্তু সবটাই তার আলোয় ভরা নয়। আবার শুধু অন্ধকারে ঢাকা দেওয়া নয়। এক পাশে আলোর ঝরণা বয়—অন্য পিঠটা তখন কালো আঁধারে ঘুমোয় যেন নিঝুম্ হয়ে। ঘূর্ণির ছন্দ-তালে আবার আলোর দিকটা ধীরে ধীরে ফিরে আসে অন্ধকারে। আর আঁধার-করা পিঠটা আলোর ঝলকানি লেগে ওঠে ঝলমল ক'রে।

আলো আঁধারের এ খেলা আছে বলেই সচল হয়ে আছে সৃষ্টি-খেলা। প্রাণের সাড়ায় জাগ্‌ছে রসের অমৃত সুর বিচিত্র-রাগিণীতে। মায়ার চিত্র-লেখা নয়। কায়ার রূপ-রেখা। সৃষ্টিকর্ত্তার এ খেয়ালী খেলা আছে বলেই এ পৃথিবী স্থাবর নয়,—জঙ্গম। এ প্রাণ জড় নয়—গীতিময়।

শুধু আলো দিয়ে ঘিরে রাখলে এক পিঠ পৃথিবীকে ঘূর্ণিতালে দোলা দেওয়া সম্ভব নয়। গতিহীন নিশ্চল হয়ে যায় তাহলে সব। আবার নিত্য সচল পায়ে ঝুমুর বেজে উঠলে, আঁধার-ঘেরা পিঠেও পড়ে সে পায়ের নৃত্য-চিহ্ন। এড়ানো যায় না আঁধারকে। তার ভেতর দিয়েও পাক্ খেয়ে ঘাঘ্‌রা দোলাতে হয় এক একবার।

আলো আঁধারের এ খেলা নিয়তই চল্‌ছে। নিয়তই সৃষ্টি অনিবার্য্য ভাবে এ ছন্দে চলেছে নেচে। পা-তোলা আর পা-ফেলা। এই তার জীবনের গতি। এই সচলতাই তাকে জীবনী-শক্তি দান করেছে। সে খেলে চলেছে—জীবন-খেলা!

হাসি কান্না নিয়েই তার জীবন-বীণা ঝঙ্কার তোলে। একটি তারে আঘাত পড়লেই, তার সুর-নিক্কণে বোল্ তোলে আর একটি। লয় আর তান্ নিয়েই তো তার সার্থক সুর-খেলা।

কেবল হাসি, কেবল কান্না—এতে জাগে কই সুর-লহরী? বীণা বাজে কই লয়-তানের ধ্বনি-দোলায়? লয় থেকে তানে, আর তান থেকে লয়ে নিপুণ আঘাতের ওঠা নামাতেই বীণা হয় মধুচ্ছন্দা।

মানুষের জীবনেও এ লয়-তানের তাই প্রয়োজন। লয়ে থামলে চলে না। আবার উদ্দমে উঠতে হয় তানে। তানে এসেও শান্তি

মেলে কই ? সুর তাল্ বজায় রাখতে নামতে হয় লয়ে। তা' না হলে সুর যে কেটে যাবে। তাল থাকবে না গানের। ব্যর্থ হবে শিল্পীর সাধন-সিদ্ধি ; সিদ্ধ-সুখ।

কণিকাদের প্রীতিভরা সংসারটা বহুদিন পরে আবার দুলে উঠলো এক সর্বনেশে ঝড়ের আকস্মিক উৎপাতে। মেঘ দেখে আগে কেউ বুঝতে পারেনি সে ঝড়ের প্রচণ্ডতার ভৈরব-রূপ।

ছোট সংসারটা কত আশা নিয়েই না বেঁচেছিল নির্ভয়ে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন কতবারই না ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল কণিকার। মা ও সে—দুটি ফুল যেন তার বাবাকে একটা বৃন্ত ক'রে ফুটে উঠেছিল সে স্বপ্ন-আশার সৌরভে। কণির বাবারও সব কিছু গৌরব ত' তাদেরই ঘিরে।

কিন্তু তাদের এত সুখ অসহ্য ঠেকেছিল নিষ্ঠুর ভাগ্যের কাছে। কুটিল্ হাসির ভ্রুকুটিতে চিক্ মিক্ করে ওঠে তার রহস্য খেলা। দুলিয়ে দেওয়া নয়, একেবারে তলিয়ে দিতে চাইল তাদের সংসার-ভেলাটা নিরঙ্কুশ ভাবে।

কোন রোগ ছিল না কণিকার বাবার, একমাত্র ব্লাড-প্রেসার ছাড়া। মাঝে মাঝে এরই প্রকোপে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠতো তারা। পর পর দু'তিন দিন ধ'রে জ্ঞান থাকতো না অনেক সময়।

একদিন তার বাবার অকস্মাৎ এমনি অবস্থায় কেঁপে উঠলো তারা সবাই। দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কাটাবার পর এক সময় তাঁর জীবন দীপ নিভে গেল।

মনে পড়ে কণিকার সেই দুঃসহ দিনগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত। আলোয় আলো করা সমস্ত জগৎটাও সেদিন নিভে গেল যেন দপ্ ক'রে এক নিমেষে। বিবর্ণ হ'য়ে গেল মুগ্ধ করা সজীব সমস্ত পরিবেশটা। চোখের জল আর ব্যর্থ-প্রাণের হাহুতাশে শুধু গুমরে গুমরে উঠতে লাগল চারিদিকটা।

পাগল হ'য়ে যায়নি কণিকার মা। চুরমার হয়ে যায়নি কণিকার নিজের দেহটাও। তবু বুঝেছিল তাদের যেন কোন অস্তিত্বই নেই আর। যেদিকে তাকায় আলোর একটা শিখাও তো চোখে পড়ে না। পথই বা কোথায় তাদের এগিয়ে চলবার। শুধু অন্ধকার। করুণ অন্ধকার।

দিন যায়। রাত আসে। মা-মেয়ের নিঃসহায় প্রাণ হাহাকার ক'রে ওঠে সেই ঘন অন্ধকারে। বুঝতে পারে না কি করবে তারা। কেমন ক'রে বুক বাঁধবে এ নিদারুণ অবস্থায়। চাপা কান্নায় মেয়েকে জড়িয়ে ধরে মা। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কেঁদে আকুল হয় কণিকা।

ছুটে আসে আত্মীয়-স্বজন। ভগবানকে ডাকতে বলে। দেয় অর্থহীন মামুলি আশ্বাস।

—তুই অমন করিস নি কণি। তুই অমন ক'রে ভেঙে প'ড়লে মার কি হবে? মা কি নিয়ে উঠে দাঁড়াবে?

বন্ধুরা আসে। সাহস দেয়। আসেন একমাত্র ভরসা মামা-মামী। মা মামার হাত দুটো ধ'রে চিৎকার করে ওঠে। কণি জড়িয়ে ধরে মামীমাকে। এ দুঃসহ অবস্থায় মামা-মামী ছাড়া নিকটতম আত্মীয় আর কেউই নেই যে তাদের।

মামী কাঁদে। মামা সান্ত্বনা দিয়ে এগিয়ে আসেন কাছে : কেন অমন করছিস্ বোন? জীবনে ঝড়-ঝাপটা আসে এমন। তবু মানুষকে আবার উঠে দাঁড়াতে হয়। তুই ভাবিস নি। আমি তো রইলুম।

মামী মৌন থেকে ঐ সম্মতি জানায় চোখের জলে। কণিকে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। পরে এক সময় বলেন : ভগবানকে ডাক্ কণি। তুই ত' ছেলেমানুষটি নোস্। পড়াশুনোও শিখেছিস্। এখনকার মেয়েরা চাকরীও করে। অত ভাবছিস্ কেন? যা হয় ক'রে চলবেখন্।

মা বলেনি এর উত্তরে কোন কথা। কণি নিজেও ভাবেনি কখনও এদিকটা। সত্যিই তো কি হবে তাদের এখন? কি ক'রে চলবে

সংসার তাদের ? বাবা তাদের সত্যিই যে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে অকূল সমুদ্রে।

অতি সংসারী মামীর সে কথাগুলো শ্রুতিকটু হলেও অমন নিদারুণ দিনে একটু আশার নিশানা তোলে। কণি ভাবে নিজের কথা। সত্যি সেও তো একটা পাশ করেছে। সে কি পারবে না অন্য সকলের মতন চাক্‌রী করতে ? ভাই নেই তার। পারবে না কি সংসারে ছেলের কাজ ক'রতে ?

অত দুঃখের দিনে শোক গেল। গেল অন্য চিন্তা। কেমন ক'রে আবার দাঁড়াবে তারা, কেমন ক'রে জুটবে তাদের গ্রাসাচ্ছাদন—সেই হল একমাত্র চিন্তা। হাসি পায় কণিকার। হাসি পায় মানুষের বেঁচে থাকার তাগিদের এই প্রহসনে।

মাকেও সান্ত্বনা দেয় সেই ব'লে ঃ ভেবোনা মা। আমি তো আছি। আমিই তোমার ছেলে মা। আমি উপায় ক'রে সংসার চালাব।

ভাবতে না পারলেও মা শোনে কণির কথা। কেঁদে ওঠে মুখে কাপড় দিয়ে ঃ তুই চাকরী করবি কণি ? হা ভগবান! এও কি পোড়া কপালে ছিল শেষ পর্য্যন্ত ?

পোড়া কপালই হয় তো। তা' না হলে স্বয়ং ভগবানই বা তাদের পিছনে লাগবে কেন এমন ক'রে ? কি পাপ করেছিল তারা ? কি পাপে ধ্বংস হয়ে গেল তাদের সুখের সংসার ?

দু' চোখ ভরে জল উপচে পড়ে কণিকার। মামা মামীকে বিলক্ষণ চেনে সে। জানে কি প্রকৃতির তারা। সেই তাদেরই আশ্রয়ে কি শেষ পর্য্যন্ত থাকতে হবে ? তা'ছাড়া আর কেই বা আছে তাদের এ দুঃসময়ে ?

হঠাৎ এক ঝলক্ মিষ্টি বাতাসের মতন কণিকার মনে ভেসে আসে এক টুকরো স্মৃতি একটা আবেশ নিয়ে।

অনেক সুদূর থেকে, যেন অনেক যুগের একটা অভিশপ্ত বিশ্রী স্মৃতি। তিনটি অক্ষর দিয়ে গাঁথা ততোধিক বিশ্রী একটা নাম। অশোকের

কথা আবার কেন এ সময় জ্বালা ধরায় তার পোড়া মনে ? কেন একটা না-ভোলা-স্মৃতি জেগে ওঠে সান্ত্বনার সুরে ঃ "ভেব না কণি। কোন বিপদ বাধাই পারবে না আমাদের ছিন্ন ক'রতে কোনদিন। বাইরের বাধা যতই শক্ত হবে—কঠিন হবে ততই আমাদের হৃদয়ের বন্ধন। তুমি আমি এক। চির দিনই এক।"

—কী মিষ্টি কথা। কী নির্ভয় সান্ত্বনা! কতই না মধুময় সে পরিবেশটা! "আমি তো আছি কণি।"—গানের একটা কলি যেন। ছন্দের মধুর তালে দোল্ লাগায় কণির আশাবরী রাগিণীতে। আবেশে হেলিয়ে দেয় মাথাটা অশোকের চওড়া বুক্‌টায়। পরম আশ্বাসে নিস্তব্ধ হ'য়ে থাকে এক নিবিড় আবেগে।

তুঃখের এই সব দিনে গল্প-করা সেই সব কাহিনী বার বার মনে পড়ে যায় কণিকার। সান্ত্বনার প্রলেপের বদলে আরও ঝলকে ঝলকে তপ্ত অশ্রু ভাসিয়ে দিয়ে যায় বুকখানা। সত্যিই অশোক যদি আজ কাছে থাকতো ? এগিয়ে আসতো এই তুর্দ্দিনে তাদের ?

নিষ্ঠুর ভাগ্যের কী নির্দ্দয় রহস্য খেলা। নাটকই হয়তো একটা একাঙ্ক। হঠাৎ ঢুকলো স্টেজে। একটু খানি সময়। তাড়াতাড়ি যে যার পাঠ ব'লে আবার চলে গেল স্টেজের কালো আবরণের আড়ালে। দর্শকের কেউ-বা মৌন থাকলো। কেউ-বা হাসলো। কাঁদলোও কেউ। তারপর আসন ছেড়ে চলে গেল যে যার ঘরে।

* *

মামা বলেন শেষ পর্য্যন্ত ঃ চল্ আমার ওখানেই। কষ্ট হবে জানি, তা'ছাড়া উপায়ই বা কি হবে তোদের। এ-বাড়ী ভাড়া দিয়ে যা হয় একটা আয় বার ক'রতে হবে। পরে কণি না হয় একটা মাষ্টারি জুটিয়ে নেবে।

কথা জোগায় না সহসা মার অশ্রুভরা কণ্ঠে। ভেবে ভেবে কূলও

দেখতে পান না আর। বোঝে ভাই-ভাজের পরিবেশ তাঁর পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক নয়। অথচ এ অবস্থায় অন্য পথও তো আর খোলা নেই। তা'ছাড়া এ বাড়ীতে কণিকে নিয়ে থাকবেনই বা কি ক'রে।

কণিরও একটা ভরসা চাই। বয়সও হয়েছে। বিবাহ তো দিতে হবে। কলেজের পড়া আর তো চালানো সম্ভব নয়।

আয় কোথায় ? নিঃস্ব তারা। চাকরীর ঐ কটা টাকা ছাড়া আর কিই বা ছিল তাদের ? মা মেয়ের খরচা এই বাড়ী ভাড়া থেকেই তুলতে হবে।

মামী মৌন থেকে এতে সম্মতি জানালেও, ভিতরে যে সুখী নয় তেমন—তা বুঝেছিল কণি। কেই বা সুখী হয় ? নিজেদের সুখের সংসারে বাড়তি কেউ এসে আসর গাড়লে ভবিষ্যৎ শান্তি সম্বন্ধে কেই বা উদ্বিগ্ন না হয় ?

সুখের নীড় একটা ঝড়ো হাওয়ায় শুধু ভেঙেই গেল না, উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পালটেও দিল সমস্ত রূপটা তার। পরাধীন জীবনের গ্লানি মাথায় নিয়ে বাধ্য হয়েই একদিন তাদের মা মেয়েকে উঠে আসতে হ'ল মামার আশ্রয়ে।

উদ্বাস্তু জীবন আরও বৈচিত্র্য লাভ করে এই বার। নূতন ক'রে জীবন-পাতা ওল্‌টাতে হয় এইখানে এসে কণিকার। মামা-মামীর চোখে তার সব কিছুই বাহুল্য। ছেলেমানুষী,—ঢং। তার আশা আকাঙ্খা যেন একটা অবাস্তব কল্পনার কু-ফল। তার লেখাপড়া—নিছক সময় কাটাবার ছল্ একটা। আর তার ডাক্তারী পড়ার সুদূর কল্পনা—যেন রূপকথার রঙীন্ ফুল।

শুধু কি তাই ? আর একটা বছর পড়ে আই. এস. সি. টা দিয়ে দেওয়ার কথা উঠতেই ঝেঁঝিয়ে ওঠে মামা : ছাই হবে পড়ে। মেয়েদের সায়েন্স্ প'ড়ে কি হবে শুনি ? এখনও এক বছর পড়তে হবে। মাইনেও তো গুণতে হবে। তারপর পরীক্ষার ফি। সেও ত' কম নয় বড়। আমি একা মানুষ। আয়ও তো দেখছিস্। কি ক'রে সামলাবো বলতো ?

মামীও জবাব দেয় ঠোঁট বেঁকিয়েঃ একটা 'পাশই' যথেষ্ট। মেয়েছেলের অত বাড়াবাড়ি না করাই ভালো।

কণিকা প্রত্যুত্তর করে না তাঁদের এ কথায়। মাও নীরব হয়ে থাকেন। অন্ধকার ঘরে একা পালিয়ে আসে কণিকা। ভরে উঠে চোখ তুটো একরাশ জলে।

মা এসে মাথায় হাত দেন। বলেন ঃ কাঁদিসনি কণি। ভগবানকে ডাক মা। মানুষতো অনেক কিছুই আশা করে—সব কি সফল হয় তার ? ভেবে দেখতো আমাদের অবস্থাটা একবার।

কণিকা শোনে না সে কথা। তু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে ঃ না মা। পড়া আমি ছাড়বো না কিছুতেই। যে ক'রে হোক পাশ ক'রবই। আর একটা বছর তো মাত্র।

—ছিঃ মা! মামার অমতে কিছু ক'রতে যেওনা। উনিই এখন আমাদের অভিভাবক। উনি অসন্তুষ্ট হলে কে আমাদের দেখ্‌বে বলতো ?

এ কথায় কণি নিরাশ হয়ে পড়ে। ভাবে বাবার কথা। মনে পড়ে ডাক্তার-কাকুর আশ্বাস বাণী।

বাবা থাকলে এ কথা কল্পনা ক'রতেও পারত না কণিকা। পড়াশুনো ছিল তার সব চেয়ে প্রিয়। কিন্তু এ কোন্ অঘটন দেখা দিল আজ ? এমন ক'রেই কি নিঃশেষ হয়ে যাবে তার জীবন ? তার সমস্ত আশা-আকাঙ্খা ?

মা আশ্বাস দেনঃ কিছুদিন অপেক্ষা কর্ কণি। পরে একটা মাষ্টারি পেয়ে না হয় আবার পড়িস। তাহলে আর মামা রাগ করবে না।

কণিও বোঝে এ কথার অর্থ। জানে, মামা টাকা পেলে চুপ ক'রে থাকবে। কিন্তু এখনই সে মাষ্টারি বা পায় কোথায় ? আর এ সামান্য বিদ্যেতে কেইবা চাক্‌রী দেবে তাকে ? বলেঃ পড়ায় ইস্তফা দিলে আর কি পড়তে পারবো মা ? সুযোগ হারালে হয়ত জীবনে আর তা আসবে না। আর কি...

কান্নায় ধ'রে আসে কণির গলা। থেমে যায় কথা। ডাক্তারী পড়ার স্বপ্ন রহস্যের মতন ঠেকে তার কাছে।

পিঠে হাত দেন মা সন্তর্পণে। ভাঙা স্বরে বলেন ঃ কে পড়াবে তোকে অত খরচা ক'রে? খাওয়াই জোটে না ভাল ক'রে ছু'বেলা। সামান্য বাড়ী ভাড়া। তার আবার সবটাই মামা নিজে আদায় ক'রে নেন সংসার চালানোর জন্যে। তার ওপরে সব সময়ই বেজার বিরক্তি। খোঁটা দিতে মামীরও সুযোগের অভাব ঘটে না এতটুকু।

চিন্তা করে কণিকা। নিঃশব্দে শুনে যায় মার কথা। ভাবে দুঃস্থ সংসারে লেখাপড়ার কল্পনাও যেন অভিশাপ একটা। এম্বিশান্—একটা প্রহসন মাত্র। বেঁচে থাকাই বাহুল্য সেখানে।

এমনিতে মামার যা আয়, তাতে সংসার ভাল করে চলে না। তার ওপর বোন ভাগ্নী এসে জুটলো। অভাবও বাড়ল আগের তুলনায় অনেক।

কণিকাদের বাড়ী ভাড়ার টাকা তেমন বেশী নয়। ঝি যাও একটা ছিল, তাও আর রাখা চ'ললো না। মা-ই তুলে নিয়েছে ও কাজটা নিজের হাতে। কণিকারও রেহাই নেই। সংসারে রান্না বাদে অন্য অনেক কাজ করতে হয় তাকে অবসর সময়ে।

তবু মামা মামীর মন ওঠে কই? সব কাজেই ত্রুটি ধরেন। বিষিয়ে ওঠেন বিরক্তিতে। কণিকাকেই শুধু শুনতে হয় না। মাকেও তার হজম ক'রতে হয় অনেক কিছু।

হাসি আনন্দ যেন তাদের আর জীবনে আসবে না। যেটুকু ভগবান দিয়েছিলেন—তা বোধ হয় এখন ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

দিনে রাতে মামীর অভিযোগের অন্ত্য নেই।

—এত বড় ধাড়ি মেয়ে হলি কণি, তবু কাজের জুত এলোনা এতটুকু। লেখাপড়া ক'রে ছাই হবে। মেয়েদের কাজই হ'ল সব। তারা যদি সংসারের কাজের উপযুক্ত না হ'ল তবে জন্মই বৃথা।

মামাও থামেন না। মাকেও শুনতে হয় নানা অভিযোগ ঃ দেখ,

দিদি, একটু সকাল্ সকাল্ উঠিস্। এমন ক'রলে কি ক'রে হয় বল্ তো ? তোর শরীর খারাপ তো লেগেই আছে। কিন্তু বৌটার দুর্গতি দেখছিস্ তো। তোরা মা-মেয়ে থাকতেও ও যদি অত খাটে, তা'হলে তো আর চলে না।

মা নীরব থাকেন। জবাব দেন না একটাও। মার অপরাধ—অসুস্থ দেহে আরও সকালে তিনি ওঠেন না কেন ? ভাবেন উঠবেন। কিন্তু রোগের যাতনায় শেষ রাতের ঝিমুনি-ভাব সহজে কাটতে চায় না।

টাকা লাগবে বলে ভয়ে রোগের কথা বলতে পারেন না মুখ ফুটে। কণির কাছেও যে চোখের জল ফেলে বুকের ব্যথা-ভার নামাবেন তার উপায় নেই। মামীর লাগানীতে মামা তা'হলে আরও অশান্তি বাধাবেন বাড়ীতে।

এমন সব ঘটনা দিন রাত ঘটছে। সইতে সইতে এখন সয়ে গেছে তাদের। মাও হেসে সহ্য করেন। কণিকাও চুপ ক'রে থাকে। মামা মামীর গঞ্জনা কোন দুঃখই আনে না এখন আর। সবই তাদের মেনে নিতে হয় ভাগ্যের দোহাই দিয়ে।

দ্বন্দ্বের আঘাতে পিষ্ট হয় কণিকার মন। ধীরে ধীরে সব কিছুতেই বিরাগ জন্মায় তার। নিবে আসে আশা-দীপ ক্ষীণ হ'য়ে। অব্যক্ত বেদনায় উপেক্ষার হাসি শুধু লেগে থাকে তার নিথর দুই অধরে।

*　　　*　　　*

এক একটা মানুষের জীবনে এমন এক একটা ঘটনা ঘটে যে নিমেষে সব ওলোট্ পালোট্ ক'রে দেয়। তা যেমন রহস্যময়—তেমনি বিস্ময়কর। ব্যক্তি তখন আর ঠিক সাধারণ থাকে না। সাধারণের একজন হলেও তখন তাকে মনে হয় অসাধারণ। বড়ই বেমানান।

মামার কাছে একটা বছর কেটেছে তাদের। এমন সময় মামা আনলেন ঐ সম্বন্ধ। এক রকম জোর ক'রে মা মামা তাকে তুলে দিলেন অমল বাবুর হাতে।

একটা মাস কণিকার বিয়ে হ'য়েছে। কিন্তু এই একটা মাসেই কী না হয়ে গেল ওর জীবনে। কটা দিন। তবু তার মধ্যে কতই না বিপুল ঘটনা ঘটে গেল। যেন প্রেক্ষাগৃহে ব'সে দর্শকের মতন দেখে গেল কত যুগব্যাপী কাহিনীর এক ছায়াছবি মাত্র কটা ঘণ্টায়।

বিয়ে হ'ল কত বড় লোকের বাড়িতে। কত আশা কত আকাঙ্খা। যুবতী জীবনের কতই না সার্থকতা মনের মতন স্বামী লাভে। প্রাণের কত সাধ। স্বামী পেল। শ্বশুর বাড়ি পেল। স্বামীসোহাগে ভরে উঠলো বুক্‌খানা আনন্দে।

কিন্তু একি হলো? তৃষ্ণার্ত্ত অধরে পেয়ালা তুলে ধরতেই হাত ফস্‌কে চুরমার হয়ে গেল সেটা মাটিতে প'ড়ে। আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লো কণ্ঠ কেন এক অব্যক্ত বেদনায়?

এ কী ভাগ্য ক'রে এসেছিল কণি? তার প্রেমে একি অভিশাপ ভগবান দিয়েছে? যখনই তাকে ফুটিয়ে তুলতে চাইছে জীবনের সব মধু ঢেলে সৌরভে—তখনই এক একটা বিষ-কীট্ তিক্ত করে দিচ্ছে তাকে।

সে তো সব পেল। মা, মামা কত কষ্ট করেই তো অমন পাত্রের সাথে তার বিবাহ দিল। শুনেছে স্বামীও তার দেবতুল্য। কোন অভাবই নেই। তবু সে পারলো কই ঘর ক'রতে? পেল কই একটা রাতও কাটাতে নব-বধু হ'য়ে স্বামীর সঙ্গে—সার্থক করতে নারী জীবনকে তার?

সবাই বুঝলো তারই অপরাধ। তা নয় ত কি? অমন স্বামী—অত বড় ঘর। কত ভাগ্য ক'রে তবে মানুষ পায়। বর না হয় দোজ্‌বরে—তাতে হ'য়েছে কি?

কণিকাও বোঝে এ কথা। কিন্তু তবু তার মনে সাড়া আসে কই? কী ক'রে প্রমাণ করবে তার মনের কথা—কোথায় ব্যথা তার?

রাগ আসে মা-মামার ওপর। তিক্ত হয় মন স্বামীর ওপর ছল্ ক'রে তাকে বিবাহ ক'রবার জন্য। কেউ প্রকাশ করেনি—তার স্বামী প্রৌঢ়। তার রয়েছে সতীন ছেলে-মেয়ে।

মনে পড়ে অশোকের কথা। জ্বলে ওঠে অন্তরটা। সমস্ত পুরুষ জাতটার প্রতি তীব্র অশ্রদ্ধায় ভরে যায় প্রাণ। কী নগ্ন ঠগ্‌বাজীই না করে তারা।

মেয়েরা যেন তাদের হাতের পুতুল। যখন ইচ্ছে করছে ভাঙছে—গড়ছে। রং লাগাচ্ছে। আবার যখন ভাল না লাগছে সে-রূপ, ধুয়ে মুছে ফেল্‌ছে।

মেয়েদের যেন কোন সাধ নেই, নেই স্বাধীন কোন সত্তা। পুতুলের মতই তাদের জীবন বয়ে চলেছে পুরুষের খেয়ালী মনের তালে তালে নেচে। তাদের ইচ্ছা, সুখ, আকাঙ্খা সবই নির্ভর করছে পুরুষের মর্জির ওপর। মেয়েদের জীবনটা যেন জীবন নয়। তাদের যেন সব কিছুই নির্দ্ধারিত হতে হবে পুরুষদের ছক্‌কাটা পথে।

কণিকা প্রতিবাদ ক'রে ওঠে তীব্র স্বরে। বার বার আঘাত পেয়ে পেয়ে রূঢ় হ'য়ে ওঠে তার কোমল মন। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সে ভেঙে পড়লেও, চুরমার হ'য়ে যায় না একেবারে। বাবার কথা মনে পড়ে—ভাগ্যের পীড়নকে পীড়ন ব'লে ধরিস্‌নি কণি। ও মাঝে মাঝে আমাদের পরীক্ষা ক'রবার জন্যই চ্যালেঞ্জ দেয়। ওকে জয় করবি পাল্টা চ্যালেঞ্জ দিয়ে।

ভয় পায় না কণিকা। ভাগ্যের এ পরিবর্ত্তনকে সে জয় ক'রতেই উঠে দাঁড়াল যেন। পুরানো জীবনকে ছেঁটে ফেলে দিল। চাইলো নিজেকে গ'ড়ে তুলতে নূতন রূপে।

ভারী রহস্যময় সে জীবন। সিঁদুর মুছে চাক্‌রীর জন্য বেরুল এখান ওখান। মা কিছু বললে, বলে: কে বলেছে আমার বিয়ে হয়েছে? আমি কুমারী। যেমন ছিলাম তেমনই আছি।

মামা বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছেন দেশে। সেখানেই থাকতে হবে তাঁকে। এ-বাড়ীতে কণিকা একা মাকে নিয়েই রইল। মামার কিছু পাঠানো টাকা আর তাদের বাড়ী ভাড়ায় একরকম ভাবে চ'লতে লাগল তাদের ছোট সংসারটা।

মা বলেন ঃ তুই কি ক'রে থাকবি কণি ? তোর জীবনটা কি এমনি ভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে ?

কণি মার হাত দুটো ধরে বলে ঃ কেন তুমি ভাবছো মা ? আমি তো সব তোমায় বলেছি। আমি আবার নতুন ক'রে জীবন গড়ে তুলবো। তুমি আশীর্ব্বাদ কর। ভগবান আমার সহায় থাকুন।

—তোর ডাক্তার কাকুর একবার খোঁজ কর্‌না ? তাঁকে একবার আস্‌বার জন্য লিখে দে। তিনি তোর বাবার বন্ধু। তোকে মেয়ের মতই দেখেন। এ দুঃসময়ে নিশ্চয়ই তিনি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন।

ডাক্তার কাকুর কথা কণিও ভেবেছে অনেক বার। বলে ঃ হ্যাঁ, তাঁর কাছেই একবার আমি যাব মা। তিনিই এখন একমাত্র ভরসা। দেখি, কি হয়।

কণিকার মনে পড়ল সে দিনের কথা। এই ডাক্তার কাকুই একদিন তাকে কথা দিয়েছিলেন—ডাক্তারী পড়াবেন। তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ছিলেন পরম আশাবাদী। বাবাও ভরসা দিয়েছিলেন তাঁর কথায়। হয়তো যে কোরে হোক একটি মাত্র সন্তানের জন্য খরচা জোগাড় করতেন তিনি। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আর।

সৃষ্টি-খেলাঘরে মানুষ-খেলনা কেবল স্বপ্নই দেখে। সাধের রং-জলে ছোপায় তার আশাকে নানান রঙে। আর বিধাতা পুরুষ বার বার সাদা জলে ধুইয়ে দেন সেই রং-বেরং এর রেখাগুলো হেসে হেসে। কাঁদে মানুষ। হা-হুতাশে বুক চাপড়ায়। খেলনা নাচে। তৃপ্তি পান সৃষ্টি-কর্ত্তা। সার্থক হয় তাঁর পুতুল-খেলা।

মাকে এক সময় বলে কণিকা ঃ আমি নার্সিং শিখবো মা। কটা তো মাস। যে ক'রে হোক টিউশনি করে প'ড়ব। তারপর ডাক্তার কাকুকে ধ'রে হসপিটালে একটা চাকরী জুটিয়ে নেব।

নার্সিংএ বরাবরই তার সুনাম ছিল। তার নিজেরও ভরসা ছিল, সে এতে নিশ্চয়ই ভাল ভাবে পাশ করতে পারবে। এই সঙ্গে মেজর বোসের

কথাও আজ তার মনে পড়ে। তিনিও তো একদিন তাকে কথা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন সাহায্য কর'বেন।

মা এ বিষয়ে অমত হন না। কণিকা সত্যই যখন নতুন ভাবে জীবন যাপন করতে চায়, তখন এ ছাড়া আর পথই বা কি? কণিকা নিজের পায়ে দাঁড়াক। তা না হলে কে তাকে দেখবে?

কণিকা সান্ত্বনা দেয় মাকে—তুমি বড্ড ভাবছ মা। কিন্তু তুমি তো আমায় জানো। দেখো, নিশ্চয়ই আমি পারবো এ কাজ। তা ছাড়া, এতো ভাল পথ মা।

শ্বশুর বাড়ীর কথা দু'জনেই ভুলে গেছে তারা। ভুলে ঠিক নয়, জোর ক'রে ভোলবার চেষ্টা করেছে। মা আর মেয়ের কাছে সে প্রসঙ্গ তোলেন না। কণিও মন থেকে ছেঁটে ফেলেছে সে সব কথা। আত্মীয়-স্বজন কোন কথা বলতে এলে সে স্পষ্ট ভাবেই শুনিয়ে দেয়—আমার বিয়ে হয় নি। আমি কুমারী।

তারা অতি সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। গায়ে পড়ে সহানুভূতি না দেখালে আত্মীয়তায় যে বাধে। তাই তাদের মধ্যে কেউ কণির ওকথায় বিস্মিত হয়। বলে: ওকথা বলিস নি কণি। বিয়ে না হলে মেয়েরা বাঁচবে কি করে?

—কেন বিয়েটাই কি আমাদের জীবনের সব? ওটা যদি নাই হয়, তবে কি সুস্থ ভাবে বাঁচা যায় না?

প্রতিপক্ষ ক্ষান্ত হয় না। বলে: তা'হলে মেয়েদের ধর্ম্মই যে যায়। ধর্ম্ম গেলে বেঁচে লাভ?

—বিয়েটা যদি ধর্ম্মই হয়, তবে তার মধ্যে এত ছল্-চাতুরী কেন? তা' সব সময় আনন্দের না হয়ে, দুঃখই বা আনে কেন? ধর্ম্ম না ছাই! ও ফাঁসির দড়ি।

—ছিঃ ছিঃ। এ-কথা মুখে আনিস নি। পাপ হবে।

—সত্য যা, তাই বলেছি,—ঝেঁঝিয়ে ওঠে কণিকা: পাপ তাই, যা দুঃখের কারণ হয়। আমাদের দেশে গরীব মা-বাবার মেয়েদের কাছে

বিয়েটা প্রায় ক্ষেত্রে ফাঁসির দড়িই। একবার গলায় আটকালে কোন ক্রমেই তা আর খোলবার সাধ্য থাকে না।

—তোর জীবনের ঘটনা দিয়ে সবাইয়ের বিচার করা কি ভালো ?

কণিকা এবার মনে আঘাত পায়। একটু চুপ ক'রে থাকে। পরে বলে : বিচার আমি করি নি। বিয়ের নাম ক'রে পীড়নের কথাটা বলছিলুম। বিয়েটা ব্যর্থ হলে মেয়েদের জীবনটাই ব্যর্থ। সমাজে কোন দামই থাকে না তার। আগেও তাই ছিল—এখনও রয়েছে। এক্ষেত্রে পুরুষের প্রভাব নিরঙ্কুশ। সে যাই হোক না কেন, মেয়েদেরই সমস্ত কলঙ্ক মাথায় করে বইতে হয়।

আত্মীয়টি এর উত্তরে কি যেন বলতে যায়, কিন্তু কণির আর এ তর্কে যোগ দিতে ইচ্ছে করে না। কাজের অজুহাতে সরে যায় অন্যত্র। একলা ঘরে এ আলোচনার রেশ টেনে ভাবতে বসে উদাস ভাবে।

কণির নিজের জীবনেও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। তাকে তাই প্রায় একঘরে হ'য়ে থাকতে হয়। আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে যায়। কোন কাজ কর্ম্মেও নিমন্ত্রণ পায়না তারা। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে— শরীরটা খারাপ ভাই। ওঁরা বলে গেলেন অত করে। কিন্তু যেতে পারলাম কই ?

বন্ধু-বান্ধবেরাও দূরে দূরে থাকে তার ছোঁওয়া বাঁচিয়ে। একদিন যারা তার সঙ্গ লাভে নিজেদের ধন্য মনে ক'রত—আজ তারা পাশ কাটিয়ে চলতেই চায়। সমাজে তার সম্বন্ধে কানা-ঘুঁষোরও শেষ নেই।

কণিকা এসব গ্রাহ্য করে না। জানে, এসবে সাড়া দিলে আরও প্রকট হ'য়ে উঠবে। উপেক্ষা করাই ভাল। মাকে বলে : তুমি তো বুঝ্‌ছো মা, আমি কোন অসৎ পথে চলছি না। তা'ছাড়া নার্সদের সমাজে কেইবা ভাল ভাবে দেখে ? বরং নার্স বলে মুখ কুঁচকেই চলে। অথচ এই নার্সরাই সামান্য জীবিকার বদলে নিঃস্বার্থ ভাবে সমস্ত জীবনটা প্রায় দান করে রুগীর জন্য।

মা মেয়ের কথায় জবাব দেন না। চুপ করে থাকেন। বয়স

হ'য়েছে তাঁর। সংসারে সবই তাঁর গেছে। ভরসা একমাত্র ঐ হতভাগী মেয়েটা। কতই বা বয়স ওর। কিন্তু এইটুকু জীবনে কত আঘাতই না তাকে সইতে হ'ল। একমাত্র সন্তান হলেও বাপ্ মা হয়ে কিই বা সুখে রাখতে পারল তারা ? বরং তাদের বেহিসেবের জন্যই ফুটন্ত ফুলের মতন ওর জীবনটা অকালে শুকিয়ে গেল। আর কোন কাজেই ওর বাধা দেবেন না। ভগবান ওকে চালান—তাঁর নিজের ইচ্ছে মতই।

মামার গঞ্জনা থেকে বাঁচতে গিয়ে হঠাৎ বিয়ে দিতে হ'ল তাড়াতাড়ি। বোঝেন তার নিজের জন্যই আজ এতো অঘটন। বলেন ঃ যা ভালো বুঝিস্ কর। আমার দোষেই জীবনটা ছন্নছাড়া হয়ে গেল তোর।

কণি বলে ঃ না মা। তোমার আর দোষ কি ? সবই আমার ভাগ্য। আমার জীবনে বিয়েটাই অভিশাপ একটা। তা না হলে বার বার এমন হয় ?

'বার্ বার্'—কথাটার অর্থ মা বুঝতে পারেন। মনে পড়ে অশোকের কথা। যার প্রতি ছিল তাদের পরম বিশ্বাস আর নির্ভয় আশা।

কণির বাবা থাকলে কি হত কে জানে। নিশ্চয়ই এমনি করে ওলট পালট হ'ত না তার জীবনটা।

মা বলেন ঃ আমার জন্যই এমন হল তোর। ওদের কোন দোষ নেই। পাছে তুই রাজী না হোস্, তাই সব কথা খুলে বলিনি আগে।

—ও-কথা আবার তুলছো কেন মা ? কণি থামিয়ে দেয় পুরানো আলোচনা। বলেছি তো আমারই ভাগ্য সব। নইলে সবই তো পেলাম। রাখতে পারলাম কই ?

—কিন্তু জামাইতো এখনও তোকে নিতে চায়। যদি শুধু তুই....

কথা সমাপ্ত হয় না। কণি গম্ভীর হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে বলে ঃ সে আর হয় না মা। ও প্রসঙ্গ ভুলে যাও। আমি তো ব'লেছি—আমার বিয়ে হয়নি।

—সারা জীবন থাকবি কি নিয়ে ? মেয়েরা কি অমন অলুক্ষুণে ভাবে থাকে ? না, তোকে আবার কেউ বিয়ে ক'রবে এদেশে ?

উষ্মায় ফেটে পড়ে মা এবার।

কিন্তু কণি আর বিশেষ কথা বাড়ায় না। মার কাছ থেকে সরে যায় অন্য ঘরে।

এ ঘটনা আজ নয়। প্রায়ই ঘটে চলেছে দীর্ঘ এক বছর ধরে। সকলের মুখে এক্ কথা—এ অলুক্ষুণে কাণ্ড। সাতজন্মে এমন কেউ দেখেনি।

কণিও দেখেনি কখনও। কিন্তু তবু কেন যে এরকম হ'ল তার? বিয়ে হয়েছে। স্বামীও জীবিত। সংসারে ছেলেপুলে রয়েছে। মেয়েদের আর কি চাই?

তবু কণিকা পালিয়ে এল। ভেবেছে এ অন্যায়। পাপ। সমাজে এই বিদ্রোহী হওয়ার শাস্তিও তো ভয়ঙ্কর। কেউ তাকে বিয়ে ক'রবে না আর এ সমাজে। সে বিবাহিতা হয়েও কুমারী। স্বামী জীবিত থাকতেও স্বামীহারা।

তবে সত্যই কি জীবন তার ব্যর্থ? মেয়েদের এ ছাড়া কি বাঁচবার কোন পথ নেই? যত অন্যায়, যত অসঙ্গতই হোক্ না কেন,—সমাজের আসন এ-পথ ছাড়া কি লাভ করা সম্ভব নয়? পুরুষদের সব পথই খোলা। একশোটা বিয়ে করলেও কৌমার্য্যে আঘাত লাগে না। সমাজের আসনও টলে না। অথচ মেয়েরা মানুষ হ'য়েও তাদের বাধার অন্ত্য নেই।

অনেক ভেবেছে। দিন রাত্রি ধ'রে এসব অনেক কথা ভেবেছে কণিকা। বিদ্রোহের তপ্তশ্বাসে রুদ্ধ হয়ে এসেছে কণ্ঠ। মিথ্যে সান্ত্বনার অনেক প্রলেপও দিয়েছে সময় সময়। কিন্তু সমস্যা তবু মিটলো কই? কণিকা তাই ছেঁটে ফেলে দেয় মন থেকে সব। জীবনকে আবার নতুন ক'রে গড়ে তুলতে হয় ব্রতচারিণী।

*   *   *

ডাক্তার কাকুকে ভোলেনি কণিকা কোন দিন। ডাক্তার কাকুও তাকে চিরদিন ভালবেসে এসেছেন নিজের মেয়ের মতন। আপদে বিপদে এমন সুহৃদ কণিকার বাবার আর কেউই ছিল না।

কণির বাবার মৃত্যুর পর তিনি দেশে ছিলেন না। বিদেশে বসে প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুর খবর তাঁর হৃদয়খানাকে বিদীর্ণ ক'রে দেয়। দীর্ঘ তিন পাতার একখানা চিঠিতে নীরব অশ্রুজলে সমবেদনা জানান কণিকাকে।

বার বার সে-পত্র পড়েছে কণিকা। ভাঁজ ক'রে সযত্নে তুলে রেখে দিয়েছে। মাঝে মাঝে খুলে পড়ে। কতবার আওড়ে যায় সেই আশ্বাস ভরা কথাগুলো—বিপদে ভেঙে পড়িস্‌নি মা। এ সব ভগবানের পরীক্ষা। জীবনকে ঘা দিয়েই তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় আশা-সামগ্রী গড়ে নেন্। নিজের এম্বিশান্‌কে কোনমতে ক্ষুণ্ণ হ'তে দিসনি।

আবার এক জায়গায় লিখেছেন ; আমি দূরে থাকলেও তোদের ভুলিনি। যখনই এ গরীব কাকুকে স্মরণ করবি, সাড়া পাবি। তোর মাকেও এ কথা বলিস্।

চিঠির শেষে বলেছেন : 'কলকতায় কবে যাবো এখন ঠিক ব'লতে পারছি না। সরকার এরপর হয়ত শিলং এ রাখবে কিছুদিন। ওখানে নূতন একটা হস্‌পিটাল তৈরী হ'য়েছে। আমার ওপরেই ওর ভারটা আপাততঃ চাপাবে মনে হচ্ছে। অসুবিধা না থাকলে তুই ওখানেই চলে আসিস্।

* *

আশ্চর্য্য লোক এই ডাক্তার কাকু। ততোধিক আশ্চর্য্য এঁর ব্যক্তিগত জীবন। কণিকা শুনেছে এঁর কথা বাবার কাছে কতবার।

বিরাট বড়লোকের একমাত্র ছেলে। অগাধ সম্পত্তির মালিক। ছেলে হিসাবেও একজন ভাল স্কলার ছিলেন স্কুল জীবনে। আই. এস. সি. পাশ ক'রেই বিলাত্ চলে যান ডাক্তারী পড়তে।

দীর্ঘ কয়েক বছর এরপর কেটে যায়। পড়া শেষ ক'রে ফিরে আসেন তারপর দেশে। মা বাবা এবার আনন্দে তাঁর বিবাহ দেবার বন্দোবস্ত

করেন। কিন্তু বিবাহের ঠিক একমাস আগে মা হঠাৎ মারা যান। আর তারপর থেকেই তিনি অবিবাহিত।

জীবনে সেবাই ছিল তার একতম কামনা। নিজের সমস্ত সম্পত্তি দান ক'রে দেন নিঃস্বার্থে। সরকার তার প্রাসাদ বাড়ীতে গড়ে তোলে এক বিরাট সেবাসদন।

লোকে আশ্চর্য্য হয়ে যায় তার আচরণে। নিজের আয়ের একটা মোটা অংশও তিনি দান করেন নানা ফাণ্ডে। কণিকার বাবা একদিন প্রশ্ন করেছিলেন এ নিয়ে।

ডাক্তার কাকু হেসে বলেছিলেন ঃ দেখ্, ওসব অভিশপ্ত ধন-দৌলত সেবার কাজে লাগলে আমার বাবা মার মৃত আত্মা শান্তিই পাবে। জামিদারী অর্থ মানেই জানবি, অনেক অন্যায় আর চোখের জলের জিনিস। ও নিয়ে ভোগ করা কঠিন।

কণিকাও বলেছে কতবার ঃ কাকু আপনি শহরে প্র্যাক্‌টিস্ না করে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান কেন? কটা পয়সা ওরা দিতে পারে আপনাকে?

কাকু কণিকার কথায় হাসেন। বলেন ঃ দূর্ পাগলি্। আমি কি টাকার জন্য ওদের দরজায় ঘুরে বেড়াই। আমার টাকা কি হবে? আমার কি সংসার আছে না, দশ-পাঁচটা ছেলেপুলে আছে?

—তবে?

তবে আর কি? সমস্ত দেশটাই আমার সংসার। গ্রামের লোকগুলো বড় দুঃখী। ডাক্তার তারা দেখাতে পারে না। আমি ডাক্তার। সেবাই আমার একমাত্র ধর্ম। দরিদ্র-নারায়ণের সেবা ক'রে পুণ্য অর্জন ক'রবার এমন মহা সুযোগ কি হাতছাড়া ক'রতে পারি?

—কিন্তু এতে তো আপনার পসার কমে যাচ্ছে। ওরা কি আপনার মূল্য বুঝবে?

—নাইবা বুঝলো। নাইবা বাড়লো পসার আমার। আমি যা শিখেছি সে তো তারা জোর ক'রে ভুলিয়ে দিতে পারবে না। তা'ছাড়া

পসার বাড়িয়ে আমার লাভ কি? এদের কাছে পসার বাড়াতে গেলে ভয়ে এরা আর আমার ত্রিসীমানায় আসবে না। মধ্যিখান থেকে আমার পুণ্যটাও যাবে মাটি হ'য়ে। কথাটা বলে হেসে ওঠেন ডাক্তার-কাকু।

কণিকাও হাসে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে কাকুর মহান হৃদয়ের যে ছবিটা দেখতে পায়—শ্রদ্ধায় তার পায়ে নুয়ে পড়ে তার মাথাটা।

বাবার কাছেও শুনেছে এই প্রসঙ্গ সে। জীবনে এমন আত্মভোলা নিঃস্বার্থ লোক আর ক'জনাই বা আছে? সারা জীবন ধরে নিজের আদর্শের যেন এক অটল পূজারী তিনি। কত লোক কত পরিবার যে তাঁর সাহায্যে বেঁচে আছে তাও শুনেছে সে। তিনি নিজেও বলেছেন কথার ছলে: দেখ্ মা, যতটুকু তোর ক্ষমতা ততটুকু দিয়েই সব সময় চেষ্টা করবি লোকের উপকার ক'রতে। পুণ্য অর্জ্জনের এ সুযোগ কখনও হারাস নি। আর্ত্ত-দীনের মধ্যেই ভগবানের সহজ প্রকাশ। জানিস তো স্বামীজি এদেরই বলেছেন দরিদ্র-নারায়ণ। এদের যতটুকু দিবি—ততটুকুই ফিরে পাবি।

—সন্ন্যাসী না হলে কি এ পথে যাওয়া যায় না কাকু?

—কে বলেছে মা? কণির প্রশ্নে বিস্মিত হন কাকু। পরে বলেন: ও বুঝেছি, তুই আমাকে লক্ষ্য করেই একথা বলছিস, না?

সঙ্কোচে কণিকা বলে: না—না। মানে····

কথা শেষ করতে না দিয়ে কাকু বলেন: আমার কথা বাদ দে মা। সন্ন্যাসী, সংসারী—পুণ্য অর্জ্জনে সকলেরই অধিকার আছে। বরং সংসারীদের পুণ্য তো আরও বেশী মা। তারা নিজেদের শত কাজে আবদ্ধ থেকে—যদি ঐসব কাজে এগুতে পারে, সেটা কি কম কথা?

—তাহলে আপনি তো সংসারী নন; আপনার পুণ্য কি কম কাকু?

—অনেক কম মা। তবে সংসারের চাপে মানুষ পিষ্ট হয়ে সব সময় এদিকে মন দিতে পারে না। যাদের সংসার নেই তারা খানিকটা ফ্রি তো নিশ্চয়ই। ডাক্তার নার্সদের পিছুটান না থাকাই ভাল। সেবা—নিরঙ্কুশ নিঃস্বার্থ হওয়া উচিৎ।

—তবে আমিও কখনো সংসারে ঢুকবো না কাকু।

কণিকার এ কথায় সেদিন চম্‌কে ওঠেন কাকু। তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন নিষ্পলক দৃষ্টিতে। তারপর একটু গম্ভীর স্বরে বলেন ঃ না মা। তোমার এসব মতলব করা উচিত নয়। তুমি যে কল্যাণী। সংসারকে সুন্দর ক'রে তোলাতেই তোমার মূল্য।

—কিন্তু আপনি যে বললেন ডাক্তার নার্সদের সংসারে জড়িয়ে পড়লে তাদের কাজের ক্ষতি হয়।

—সে সবার পক্ষে খাটে না মা। ওটা একটা এমনি নীতির কথা ব'লছিলাম। তাছাড়া, সংসারী হয়েও তো এ পথে আসার কোন বাধা নেই। এই তো আমার কাছে যে ক'জন নার্স কাজ করে, তাদের অনেকেই বিবাহিতা। আমার ক'জন ছাত্রী বড় ডাক্তার। তাদের অনেকেই সংসারী। আসল কথা, নিজের কর্ত্তব্য ক'রবার জন্য চাই মনের বল। নিজের আদর্শকে রূপ দেবার জন্য চাই দৃঢ় সঙ্কল্প—অটল চিত্ত।

কণিকা তন্ময় হয়। ভাবে ডাক্তার কাকু কত বড়। তার মুখের কথা, যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য—সত্যই সব সংশয়কে কত সহজে দূর ক'রে দেয়।

বাবার মতন শ্রদ্ধা করতো কণিকা তাঁকে। সকল দুঃখে কষ্টে তাই বার বার স্মরণ করতো কাকুর সে সব কথাগুলোকে।

*　　*　　*

ডাক্তার কাকু, কণিকার বাবা মারা যাওয়ার আগেই হঠাৎ চলে

যান বিদেশে। বেশ কিছুদিন আর তাঁর খোঁজ মেলে না। কণিকারা চলে আসে এর পর মামার-বাড়ী। বছর ঘুরতেই মামা তার বিয়ের সম্বন্ধ করে। মাত্র তিনটি বছর। কিন্তু নাটকীয় ভাবে কণিকাদের পরিস্থিতি যায় পাল্টে। অনেক করেও কণিকা তখন ডাক্তার কাকুর কোন খোঁজ পায় না।

যখন খোঁজ এল কাকুর, তখন আশ্চর্য্য পরিবেশে ভেসে চ'লেছে তার জীবন-তরী। অনেক ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে কণিকা তখন। বিয়ে হ'য়ে গেছে। কিন্তু সে সুখ তার সয় নি। পালিয়ে এসেছে শ্বশুর-বাড়ী ছেড়ে। মামা এরপর সব সম্পর্ক তুলে ছেড়ে গেছে তাদের।

কণিকার একটা টিউসনি আর বাড়ী ভাড়ায় তাদের মা মেয়ের সংসার চলে আজকাল। সকাল থেকে সন্ধ্যে দুঃখের সংসারে ভাঙা-দাঁড় টানতে টানতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে কণিকা। মা দেখে। বোঝেও সব। নীরবে সমস্ত ব্যথা সয়ে যায়। চেয়ে চেয়ে দেখে মেয়ের অবসন্ন দেহটার দিকে। আর বিগত দিনের কথা ভেবে চোখ মোছে আঁচলে।

—এমন করে ক'দিন আর সংসার চালাবি মা ?

মার প্রশ্নে কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না কণিকা। একটু ম্লান হেসে বলে ঃ যতদিন ডাক্তার কাকু কিছু একটা না ক'রে দেয়।

মেয়ের কথা স্পষ্ট হলেও সহজ নয়। একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ তাঁর কি কোন খোঁজ পেয়েছিস ? সব কথা লিখেছিস্ তাঁকে চিঠিতে ?

কণিকা খোঁজ পেলেও, তখনও কিছু লেখেনি। মার কাছে মিথ্যো ক'রে বলে ঃ হ্যাঁ, তাঁকে সব কথা লিখেছি। তা'ছাড়া, সবই তো তিনি জানেন। নিশ্চয় কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবেন দেখো।

ভগবানকে স্মরণ করে মা। হাত দু'টো মাথায় ঠেকিয়ে প্রার্থনা করে, তাদের ওই শেষ আশ্রয়টুকু যেন ভেঙে না যায় আর।

তারপর মেয়ের কাছে এসে বলেন ঃ যদি কাকু রাজী হয় তুই তাঁর কাছেই থাকগে যা। ওঁর কেউ নেই। তোকে মেয়ের মতই ভালবাসে। তা'ছাড়া বয়স হয়েছে। একটা দেখা-শোনার লোক পেলে খুশীই হবে বরং।

মায়ের কথার গভীর অর্থটা বুঝতে দেরী হয়নি কণির। বোঝে কাকুর কাছে তাকে পাঠাতে মার এত আগ্রহ কেন ?

* * *

নদী চলে আপন তালে। ঢেউয়ের ছন্দে দুলে দুলে দু'পাশের বালুতটে এঁকে যায় জলের আল্পনা। দেখতে দেখতে এক কূল যেমন ভাঙে—অজান্তে অপর কূলে তখন পলি জমে। বিস্তৃতি লাভ করে পরিধি।

সংসারের দুঃখ সুখের ঢেউও তেমনি মানুষের জীবনকে দোলা দেয় বাঁচার ছন্দের তালে তালে। দুঃখে একদিকে তার যখন হাহাকার ওঠে—সুখের নিশানা তখন অন্যদিকে আশার সবুজ-নেশা জাগায় দু'চোখে। তাই এত দুঃখ কষ্টেও আশার-সরণী বেয়ে মানুষ এগিয়ে চলে আবার। বাঁচার স্বপ্নও দেখে নতুন ক'রে।

দেখতে দেখতে ইতিমধ্যে কেটে যায় দু'টো বছর। শূন্য জীবন আরও শূন্যতায় ভরে ওঠে কণিকার মার হঠাৎ মৃত্যুতে।

ডাক্তার কাকু নিজে এসেও অনেক চেষ্টা করেন তাঁকে বাঁচাতে। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির কবল থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন না আর। দিনের পর দিন দুঃসহ দারিদ্র্য আর দুশ্চিন্তার আতসে ঝাঁঝ্‌রা হ'য়ে গেসলো দেহটা। অল্প আঘাতেই তাই ভেঙে পড়লো একেবারে।

জীবন মরুর মধ্যে বার বার মরীচিকা হাতছানি দিয়েছে কণিকাকে। ছুটে গেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে তৃপ্তির আশায়—কিন্তু পরক্ষণেই থমকে দাঁড়িয়েছে নিরাশায়। তবু কণিকা দমেনি। 'সব ভাগ্য' ব'লে বন্ধ করেনি চলা। তাই এবারের আঘাতেও ভেঙে পড়ল না।

ডাঃ কাকু নিজে থেকে সব ভার তুলে নেয় তার। বলেন ঃ দুঃখ করিসনি কণি। আমি তো আছি। বুড়ো কাকুকে ছেড়ে তুইও আর যাসনি কোথাও। ভগবানকে বল, আর যেন বাপ-বেটিতে বিচ্ছেদ না ঘটে কখনো।

কণিকা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কাকুকে সেদিন গভীর আবেগে। তারপর তারা আর কখনও ছাড়াছাড়ি হয়নি।

কণিকা এর কিছুদিন পরে শিলং চলে যায় কাকুর সঙ্গে। প্রাচুর্য্যে ভরা তাঁর বিরাট সংসারে এক নতুন জীবন শুরু হয় কণিকার। রাজকন্যার মতই সোনার-কাঠির ছোঁওয়া লেগে জেগে ওঠে তার রূপকথার জীবন। পুরানো দিনের দারিদ্র্যে ভরা সে জীবন তখন অতীত কাহিনী মাত্র হ'য়ে ওঠে।

মা-মরা সর্ব্বহারা কণিকাকে সবকিছু দিয়েই কাকু আবার নতুন ক'রে গড়ে তুলতে চাইলেন। সাজ পোযাক পালটালো কণিকার। নতুন গাড়ী কিনলেন। ঝি এল। চাকর রইল।

যখন তখন কাকু এসে জিজ্ঞাসা ক'রতেন ঃ কেমন লাগছে মা? কোন অসুবিধা নেই তো? সবই তোমার। যেমন খুশী তেমন ক'রে থেকো। কোন অসুবিধার কথা লুকিও না।

কণিকা ছোট্ট মেয়ের মতই সরে আসে কাকুর কোলের কাছে। হেসে বলে ঃ কই কাকু আমার তো কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তুমি কিচ্ছু ভেব না। আমি খুব সুখেই আছি।

সত্যই সুখের ফেনায় ভ'রে উঠেছিল কণিকার মন প্রাণ। জীবনের এ পরিবর্ত্তন তার কাছে যেমন আকস্মিক—তেমনই চমকপ্রদ। কোথায় ছিল—আজ আবার কোথায় এসেছে।

মনে পড়ে অশোকদের কথা। সামান্য কটা টাকার গুমরে যারা একদিন ঠকিয়েছিল তাদের সকলকে। মনে পড়ে মার কথা। কি

দুঃখেই না শেষ হয়েছে তাঁর জীবন। মনে পড়ে তার নিজের জীবনের সেই অশুভ লগ্নর কথা।

*　　*　　*

দর্পে দুলে ওঠে কণিকার অন্তরটা একটা ঘটনায়। আবার পর মুহূর্ত্তেই কেঁপে ওঠে থর থর ক'রে। আবার ভাগ্য তার সংগে রসিকতা করছে না তো? হাসছে না তো সৃষ্টিকর্ত্তা আবার এক নতুন খেল্ খেলে?

—সত্যি কাকু? ছুটে এল কণিকা কাকুর কাছে আনন্দে লাফিয়ে।

—হ্যাঁ মা! মেজর বোসই সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন একরকম। তিনি তোকে সত্যি ভালবাসেন রে পাগলি।

আবেগে ফুলে ওঠে কণিকার বুকখানা।

—কাকু-কাকু, ডিয়ার কাকু সত্যই তুমি ডিয়ার।—উচ্ছলতায় ভেঙে পড়ে কণিকা কাকুর গলা ধরে ছোট্ট মেয়ের মতন। আব্দারে তার কথা থেমে যায়। তারপর এক সময় ভাবের ঘোর কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করেঃ তোমায় ছেড়ে থাকব কি ক'রে সেখানে?

—ছুটিতে আসবি। তা'ছাড়া আমিও হয় তো শিগ্‌গির ট্রান্সফার হব কলকাতায়।

*　　*

মাস দুয়েক পরেই কণিকা কলকাতায় চলে আসে শিলং ছেড়ে। কাকুই তাকে সঙ্গে ক'রে এনে রেখে গেলেন তাঁর নতুন ফ্ল্যাটে। ওখানকার মতন এখানেও কোন অসুবিধা রাখলেন না তার। সব চেয়ে ভরসা—মেজর বোস্ নিজেই ব'লেছেন প্রতিদিন এসে খোঁজ নিয়ে যাবেন কণিকার।

কণিকার বহু ইপ্সিত আকাঙ্খা এমন ভাবে যে ভগবান সার্থক ক'রে তুলবেন তার জীবনে—ভাবতেও পারেনি সে। মেজর বোসের সুপারিশে মেডিকেল কলেজেই ভর্ত্তি হল কণিকা ডাক্তারী পড়তে। যে আশা একদিন অঙ্কুরে গিয়েছিল শুকিয়ে, তাই এখন সজীব হয়ে ফুটে উঠলো তার জীবনে।

দরিদ্র ঘরের সন্তান। শুধু স্বপ্নের জাল বুনে এসেছে। বাবা মা তাকে যেটুকু স্বচ্ছলতা দিয়েছিলেন—তা সে সাধারণ ঘরেরই সুযোগ-সুবিধা। কাকুর ঘরের এতখানি প্রাচুর্য্য সে কল্পনা করেনি। কাকু আশ্বাস দিয়েছিলেন বটে, তবে তাকে বাস্তবেও যে এমন সার্থক ক'রে তুলবেন—এতটা ভাবেনি কণিকা। প্রথম দিকে তার জীবনে আঘাতের পর আঘাত এল একটা একটা ক'রে। চুরমার ক'রে দিল তার জীবন-স্বপ্ন, সতেজ আশা-আকাঙ্খা। কণিকা ভাবলো ভাগ্যের এ চরম নির্দ্দয়তাই বুঝি তার জীবন-নাট্যের যবনিকা পাত করবে।

কিন্তু এখন এ কি শুভলগ্ন এল তার জীবনে! কে বুঝেছিল সব ভাঙন-খেলার মধ্য দিয়ে এমনি ক'রে এগিয়ে আসবে এক অপূর্ব সৃষ্টি-খেলা ?

ভয় আসল মনে। সংশয় জাগলো ক্ষণে ক্ষণে। সত্যিই কি তার জীবনের স্বর্ণদ্বার খুললো ? সত্যিই কি কাকুর জীবনে কণিকাই এখন সব ? তাঁর একমাত্র আশা-প্রদীপ ?

কাকু বলেছিলেন একদিন ঃ ভগবানের এমনই খেলা মা। কে জানতো তোকে দিয়ে এই শেষ জীবনে আবার সংসার পাততে হবে নতুন করে ? আল্‌গা বাসায় খুঁটি দিয়ে সাজাতে হবে শক্ত-চালা ?

অভিমানিনী কণিকার চোখের পাতাগুলো ভিজে যায় জলে। নীরবে শোনে কাকুর কথা।

—আমি কি ভাবছি জানিস মা ? তোর বাবার কাছে আর জন্মে বোধ হয় অনেক ঋণ ক'রেছিলুম। তাই সে শোধ নিতে এমন ক'রে পালিয়ে গেল আগে আগে।

চাপা দীর্ঘশ্বাসে কেঁদে ওঠে কাকুর প্রাণ বন্ধু বিয়োগের করুণ স্মৃতিতে।

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কণিকাও থামিয়ে ফেলে হাতটা। বাবার কথা কানে ঢুকতে চোখের জল ছাপিয়ে ওঠে। জীবনে তার মতন এমন হতভাগী আর কেউ আছে নাকি ? তার বাবার মত বাবা ক'জনার ভাগ্যে জোটে ? কিন্তু অকালে কি করেই না ভগবান তাঁকে ছিনিয়ে নিলেন।

কাকুর কথায় অনেকক্ষণ পরে সাড়া দেয় কণিকা ঃ তুমি ভারী দুষ্টু কাকু। ঐ সব বলে আমায় কেবল কষ্ট দাও, আর নিজেও কষ্ট পাও। আমি না এলেই বাঁচতে যেন।

—ছিঃ ছিঃ মা। এসব কি বলছিস্ ? তুই না এলে তোকে ছাড়তুম নাকি আমি ? এ বুড়োকে তুইও কি একা ফেলে রাখতিস্ ?

—তুমিই তো পালিয়ে গেলে।

হেসে ফেলে কাকু কণিকার ছেলেমানুষীতে। বলে ঃ না রে পাগলি। পালাবো কেন ? আমি অনেক দিনই ভেবেছিলুম তোকে আমার কাছে এনে রাখব। কিন্তু মাঝখান থেকে হঠাৎ বাইরে চলে যাওয়ায় সব ওলোট পালোট হ'য়ে গেল। আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলুম এখান ওখান। তোরাও সব রইলি আত্ম-গোপন ক'রে। বৌদিও লিখল না একখানা চিঠি। হয় তো ভাবলো, আমার মত একটা বাউণ্ডুলে লোকের দ্বারা কিইবা হবে ?

কণিকা শুনে যায়। ভেবে পায় না এসব কথার কি জবাব দেবে ? তাই নীরব হয়ে থাকে। স্মৃতি রোমন্থনে শুধু সজল হয়ে উঠতো ডাগর চোখ দুটো তার।

* * *

কণি আসার পর কাকুর মনে এসেছে এক রঙীন আশা।

তিনি সংসার গড়েন নি। নিজেই একদিন তার সকল সম্ভাবনাকে ভেঙে দিয়েছিলেন। ভাবতেন সমস্ত দেশটাই তো তাঁর একটা বিরাট পরিবার। সহস্র সহস্র ছেলে-মেয়ের নিত্য হাসি কান্নায় ভ'রে আছে তাঁর মন প্রাণ। কিন্তু এই ছোট নীড়টুকু কণিকাকে নিয়ে আজ যেন নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরেছে তাঁকে।

কোথায় ছিল কণিকা আর কোথায় ছিলেন তিনি। কোন আত্নীয়ও নয় কেউ কারুর। নিছক প্রীতির বাঁধনে আজ তাদের পরিচয় বাপ-মেয়ের। কেউ যে কখনও বিচ্ছিন্ন ছিল, বিশ্বাস হয় না আজ। এখন তাঁর অবস্থা যেন সেই ভরত মুনির মত। হরিণ শাবকের মতন কণিও তাঁকে জড়িয়ে ধরলো মায়ার কঠিন বাঁধনে।

কতক্ষণ তন্ময় হয়েছিলেন কাকু জানেন না। কণিকা গায়ের ওপর চাদরটা টেনে দিতে তাঁর চমক ভাঙ্গলো।

কণিকা জিজ্ঞাসা করে : অমন তন্ময় হয়ে ভাবছো কি ? সন্ধ্যের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর খারাপ করবে যে।

কাকু রহস্য করে বলেন : তুই থাকলে আর ভয় কিসের ? সব ভার তো এখন তোরই। যতদিন বাঁচব থাকবি তো আমার কাছে ?

যাবেই বা কোথায় কণিকা ? তার আপন-জন বলতে কেইবা আছে পৃথিবীতে ? তাই একটু থেমে বলে : তোমায় ছেড়ে আর কোথাও যাব না কাকু। তুমি ছাড়া আর কেইবা আছে আমার ?

—সত্যি কণি, বুঝছি এখন কেন পুরুষ ঘর বাঁধে ? কেন পরিবার গ'ড়ে বাস কোরতে সে এত আগ্রহী। আজ আমি ক্লান্ত। দিন দিন বয়সও বেড়ে যাচ্ছে। যত বুড়ো হচ্ছি—ততই কেবল নিজের ভাবনাটা মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। একটু ভালবাসা, একটু সেবা, একটুখানি শান্তির পরিবেশের জন্যে হু হু করে ওঠে প্রাণটা।

অবাক কণিকা। নিথর চোখে তাকিয়ে থাকে কাকুর ভাবালু মুখখানার দিকে। আশ্চর্য্য হয় তাঁর কথায়।

—জানিস মা, মেয়েরাই সংসারকে করে স্বর্গ। তিল তিল ক'রে

তাকে গড়ে তোলে হৃদয়-ঢালা প্রেম, অমেয় প্রীতি আর অসীম সহনশীলতায়। পুরুষের অশান্ত—অবোধ মনটাকে তারাই কি এক যাদু মন্ত্রে বশ ক'রে রাখে। সুন্দর ক'রে তোলে এই ধুলোর ধরণীকে।

—তুমি এ সব স্বীকার কর কাকু? শ্রদ্ধা কর মেয়েদের এ শক্তিকে? কণিকার নীরব কণ্ঠে প্রশ্ন ওঠে এতক্ষণে।

—নিশ্চয়ই করি। সকলকেই একদিন স্বীকার করতে হয় এ কথা। যারা না করে, তারা নিজেদেরই ঠকায়। জানিস তো স্ত্রী শুধু স্বামীর সহধর্ম্মিণীই নয়—সহমর্ম্মিণীও বটে। পরস্পরের ত্যাগ ও প্রেমেই তো গড়ে ওঠে সুখের সংসার। সেখানে প্রীতি আসে। কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাকুর কথায় বিস্মিত হয় কণিকা। যে-লোক জীবনে বিয়ে করল না, বাঁধল না সংসার,—তার মুখে এ আদর্শের কথা শুনে সত্যই চমক লাগে মনে।

কথার ফাঁকে জিজ্ঞাসা করে সে: বিয়েটাই কি সব কাকু? সে ছাড়া অন্য পথ কি মেয়েদের নেই শান্তি পাবার?

সোজা হয়ে উঠে বসেন কাকু। বিয়ের ওপর কণির কেন যে এত রাগ, তা তিনি বোঝেন। কণিকা কিছু লুকোয়নি তাঁকে। সব বলেছে খুলে। কাকুও শুনেছে তার সমস্ত কাহিনী। ছোট্ট প্রাণের আরও ছোট্ট এক টুকরো ঘটনা। কিন্তু একেবারে তুচ্ছ ক'রে তাকে সরিয়ে দিতে পারেননি তিনি।

যুক্তি দেখিয়েছে কণি তাঁকে। খণ্ডন করেছে তর্কের বলে চোখের জলে সব অনুরোধ, সকল আদর্শের কথা। কিছুতেই তার ভুল ভাঙাতে পারেন নি কাকু।

একদিন নয়, দু'দিন নয়। কত সময় সেই একই ঘটনার চ'লেছে পুনরাবৃত্তি। কণিকা ফেটে পড়েছে উল্কার মতন এ সমাজের বিবাহ নীতিতে। ভৎ র্সনা ক'রে উঠেছে পুরুষের অন্যায় আব্দার, আর নির্দ্দয় ছেলেখেলায়। ঘৃণায় তিক্ত হয়ে গেছে প্রেমের ভনিতায় তার অন্তরাত্মা।

আর্ত্তনাদ ক'রে দূরে সরে গেছে—যখন কাকু নমুনা দিতে গেছেন ভারতীয় নারীর উজ্জ্বল ত্যাগ মহিমার। দুই হাতে কখনো কণিকা তাঁর হাত দুটো ধরে কেঁদে উঠেছে ঃ সব মিথ্যে কাকু। সব মিথ্যে। তুমি বিশ্বাস করো। আমার বিয়ে হয়নি। ওকে তোমরা বিয়ে ব'লে আমায় ধ্বংস ক'রে দিও না। বাঁচতে দাও আমাকে···· ! চিৎকার ক'রে উঠেছে সে —চাইনা ও বিয়ে আমি। খুঁজে দেখব ওছাড়া মেয়েদের অন্য পথ আর আছে কি না ? আমার কিছু হয়নি কাকু। আমি তোমার সেই ছোট্ট কণিই আছি এখনও··· !

এরপর একটা কথাও বলেন নি কাকু আর কণিকাকে। সস্নেহে হাত ধরে কোলের কাছে এনেছিলেন টেনে। বলেছিলেন ঃ তাই ঠিক মা। তুই সেই আগের মতই থাক্। আমি তোকে আমার মনের মত ক'রেই গড়ে তুলবো। কোন অভাব রাখব না তোর।

কণিকা আর কাঁদেনি এরপর। হাসি ফুটেছিল তার মুখে। শপথ করেছিল কাকুর কাছে—আর কোনদিন কাঁদবে না সে। ভুলে যাবে অতীতের সব দুঃখ জ্বালা।

হঠাৎ আজ কণিকার মুখে ও-প্রশ্ন শুনে তার গূঢ় অর্থটা তাই ধরতে পারে নি কাকু। সহজ ভাবে বলেন—তা কেন মা ? পথতো একটা নয়। শান্তির পথে চলা সকলেরই কাম্য। বিয়ে একটা উপলক্ষ্য। সংসারের শান্তি এ উপলক্ষ্যর মাধ্যমেই সহজে আসে। মানুষের নীতিও একে শোভন বলে মনে করে। তাইতো বিবাহটা একটা বন্ধন হ'য়েও প্রীতিময়। নারী-পুরুষের সহজ মেলামেশার শান্তি-গ্রন্থি। মধুর সংসার জীবনের কল্যাণ-গণ্ডি।

নীরব থাকে কণিকা। মনে পড়ে যায় তার নিজের কথা। কিছুক্ষণের জন্য যেন হারিয়ে যায় কোথায়।

* *

দেখতে দেখতে কেটে যায় কটা বছর এরপর। কণিকা ডাক্তারী পড়তে কলকাতায় চলে এসেছিল কিছুদিনের মধ্যে। তার কাকু তখনই আসতে পারেন নি। শীঘ্রই তিনিও চ'লে আসেন কলকাতায় শিলং থেকে।

ডাক্তারের সুনাম ছড়িয়ে প'ড়েছিল সর্ব্বত্র। মেডিকেলের নাম করা ক'জন এক্সপার্টের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কণিকার সুনাম আর পজিশান্‌ও অনেকের উঁচুতে তাই। তা'ছাড়া তার নিজের কৃতিত্বেও কলেজের মধ্যে সে ছিল একটা জুয়েল্।

সকলেই জানে তাকে। সকলেরই প্রিয় সে। তার সঙ্গ লাভে অনেকেই তৎপর। শুধু পড়াশুনোয় নয়। সেই সঙ্গে রূপ আর প্রাচুর্য্যভরা পরিবেশও তার সঙ্গকে ক'রে তুলেছিল অনেক বেশী মোহনীয়।

কণিকা বুঝতে পারে সব। প্রাণের মরচে-পড়া তারগুলোয় অজান্তে ঝংকার তোলে কোন্ এক আবেগ শিহরণ। মোথিত ক'রে দেয় সমস্ত মন প্রাণ মধু-পরিবেশের ক্ষণিক এক আবেশে। দোলা লাগে প্রাণে। ভুলে যাওয়া কোন একটা গানের কলি গুঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে গোপনে। কিন্তু সহসা অবচেতন মনে কিসের যেন এক আঘাত বেজে ওঠে সশব্দে। চমকে ওঠে কণিকা। থম্‌কে দাঁড়ায়। সুরের তাল কেটে অসমাপ্ত রেখে দেয় গানখানা নিঃশব্দে।

কাছে এসে দাঁড়ায় অশোক। ছবির মত দূরে দেখা দেয় বুড়ো স্বামীর বিষাদ ভরা মুখখানা। খুলে যায় চাপা দেওয়া কাহিনীর স্মৃতি-কপাটটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের দমকা হাওয়ায়।

কণিকার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। পথ তার এখন আলোয় আলো। সব সমস্যা কেটে গেছে। শুধু এগিয়ে চলা এখন আশার-বীজ বুনে।

কাকুর কত আশা।—দেখিস মা, মুখ রাখিস আমার। ফাইনালেও যেন এ রেকর্ড অক্ষুণ্ণ থাকে। মেজর বোস্ বড় মন নিয়ে তাকিয়ে আছেন তোর দিকে। ভুলে যাসনি যেন তুই সাধারণ মেয়ে নোস্।

কণিকাও মনে রাখে সে কথা। জানে তার ওপরেই কাকুর মান সম্ভ্রম। মেজর বোসের পরম আশা। গর্বে ফুলে ওঠে বুকখানা। বলে : নিশ্চয়ই পারবো কাকু। তুমি দেখে নিও। ফাইন্যালেও রেজাল্ট ভাল ক'রে ঐ স্কলারশিপটা নিশ্চয় হোল্ড কোরব। জানতো স্টেট্-স্কলারশিপ নিয়ে ফরেন্ যাওয়ার প্রেসটিজটা কত বড় ?

খুশীতে মন ভ'রে ওঠে কাকুর। তাঁর অগাধ বিশ্বাস কণির ওপর চিরদিনই। বুঝেছেন সত্যই সে খাঁটি সোনা। বলেন : তা ঠিক মা। মেজর বোসও সে কথা বলছিলেন। নিজের টাকায় যাওয়া আর স্টেট্-স্কলারশিপ হোল্ড ক'রে যাওয়া দুটোয় অনেক তফাৎ।

কণিকা পরিশ্রম করে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে। এ সম্মান তাকে পেতেই হবে। কাকুর স্বপ্ন তাকে সফল ক'রে তুলতেই হবে। দেখিয়ে দেবে তার ক্ষমতা আছে। মেয়ে বলে কম নয়। পুরুষের চেয়ে কোন অংশে হেয় নয়।

আলোচনা চলে বন্ধুদের সংগে। উৎসাহে চ্যালেঞ্জ নেয়।
—দেখবি মীরা আমি পারবোই। ফরেন্ তো এমনিতেই পাঠাবেন কাকু। তবে স্টেট্স্কলারশিপ পেয়ে যাওয়ার আলাদা একটা চাম আছে।

—আমরা জয়েন্ট্লি তোকে পার্টি দেব তোর অনারে সেদিন। সত্যি আমাদের ভেতর তুইই সব চেয়ে এফিসিয়েন্ট। আমরা সকলেই তোর জন্য ফিল্ করি।

বন্ধু ইরা বলে : ফরেনে গিয়ে রিসার্চ ক'রবি তো ?

—সিওর। এবং তারও মেজর বোস্ সব ব্যবস্থা করে দেবেন আমায়।

ইলা কাছে এসে হাত ধরে কণিকার : তাই নাকি ? তা, কার আণ্ডারে ?

গর্বে বেণীটা দুলিয়ে কণিকা উত্তর দেয় : তাঁরই এক ছাত্রের

আণ্ডারে। এখন সে জার্মাণীতে। খুব ব্রিলিয়াণ্ট্। ছাত্র জীবন ব'লতে গেলে ওখানেই তার কাটে। তা'ছাড়া ফরেন সে এখন নাম করা একজন ইণ্ডিয়ান; যে ঐ সাবজেক্টে স্কলার বলে খ্যাতি লাভ ক'রেছে।

শুধু কণিকা নিজে কেন, ফ্রেণ্ড-সার্কেল সকলেই এক উচ্ছল আনন্দে হয়ে উঠ্‌ল উৎফুল্ল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন।—তার নাম কি? কি সাবজেক্ট্ রে? ফিরছেন কবে দেশে? কেউ বা আবেগে চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করলো—তাঁর বয়স কত রে?

এবার রহস্য যেন উঠল সপ্তমে। কণিকা গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়: একশো-পাঁচ।

তার কথায় লতা কান্নার সুরে একই তালে চেঁচিয়ে উঠল—মাত্র একশো-পাঁচ?

হা-হা রবে হাসির বন্যায় ভেসে যায় সমস্ত হল্-ঘরটা। মাদকতা ভরা চটুলতায় ছড়িয়ে পড়ে আনন্দ কণা।

সিরিয়াস্ হয়ে ওঠে কণিকা। হঠাৎ আসর ভেঙে উঠে চলে যায় দরজার কাছে। মুখটা বেঁকিয়ে বলে: নারে, মাত্র আটাশ্। তারপর দরজা ভেজিয়ে পালিয়ে যায় অন্য ঘরে।

* *

মনে পড়ে কণিকার সেদিনকার কথা।

সারা দিনরাত ধরে সে কি কৌতুক। কী মুগ্ধ করা আবেশ। কণিকা নীরব হয়ে শুনছিল মেজর বোসের সে-কথা।

—সত্যি মা, আমার যথার্থই গর্ব বোধ হয় তার কথা বলতে। শুধু ব্রিলিয়েণ্ট্ নয়। যেমন ভদ্র তেমনি বিনয়ী। রূপ ও স্বাস্থ্য ভগবান তাকে হিসাব ক'রেই দিয়েছেন। অমন ছেলে হাজারে একটা মেলে।

কণিকার বুকখানা ভ'রে যায় আনন্দে। ধীরে ধীরে বলেঃ তিনি কি আপনারি আণ্ডারে এখানে·······

কণিকার অসমাপ্ত কথার মাঝখানে মেজর বোস্ বলেনঃ না না, মা। সে এখানকার ষ্টুডেন্টই নয়। বরাবর ফরেনেই পড়াশুনো করেছে। বাপের একটি মাত্র ছেলে। মস্ত জমিদার। আমার বাবা ছিলেন এদের ফ্যামিলি ডক্‌টর। সে আজ অনেক কাল আগের কথা।

কণিকা তন্ময় হ'য়ে শোনে। কথার ফাঁকে কল্পনা করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে। রোমঞ্চিত হয়ে ওঠে চঞ্চল মন তার।

—হ্যাঁ, বংশ বটে একটা। কথা থামান না মেজর বোস্। বলে চলেন উৎসাহে আবার—যেমন বড় বংশ, তেমনি বড় মন। বাবা মারা যাওয়ার পর ওরাই আমাকে ডাক্তারী পড়ায় সাহায্য করে। আর সেই থেকেই ওদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

—উনি তাহলে আপনার ডাইরেক্ট ছাত্র নন?

কণিকার প্রশ্নে চোখ তুলে তাকান মেজর বোস্। বলেনঃ তবে ইন্‌ডাইরেক্ট ছাত্র ব'লতে পারো।

—জার্মানীতে তখন ও থিসিস্ তৈরী ক'রছে। প্রায়ই পোষ্টে আমি ওকে এ্যাড্‌ভাইস দিতাম। পেন্-টিচিং আর কি। যেমন পেন্-ফ্রেণ্ডশিপ্। ও একটা থিওরী পোষ্টে পাঠাতো, আমি তার সল্‌ভটা এখানে বসে তৈরী ক'রে তাকে ফেরৎ পাঠাতুম।

—বেশ মজাতো।

—হ্যাঁ মা। এই মজার মধ্যে দিয়েই তার সঙ্গে আমার গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক দানা বেঁধে ওঠে। আশ্চর্য্য তার নিষ্ঠা। অভিনব তার কন্‌সালটিং প্রসেস্।

শিষ্যের কথা নয়। যেন গল্প বলে যান তিনি। কণিকারও উৎসাহ কমে না। ধীরে ধীরে শোনে তার রিসার্চের প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি গবেষণা করছেন দুরারোগ্য ক্যান্‌সার রোগ নিয়ে। মানুষকে কি করে—কোন্ সহজ উপায়ে এর হাত থেকে রক্ষা করা যায়, তাই তার

গবেষণার বিষয়বস্তু। নতুন থিওরী শুধু তৈরী করেননি তিনি। সেই সঙ্গে সহজে স্বল্প মূল্যের প্রতিশেধকও করেছেন আবিস্কার। যার জন্য জগৎ জুড়ে তাঁর নাম আজ পড়েছে ছড়িয়ে। প্রশংসার বরমাল্যর সঙ্গে তিনি লাভ ক'রেছেন অম্লান গৌরব—'ডক্টর অব সায়েন্স্' উপাধী।

আমন্ত্রণ আসছে দেশ বিদেশ থেকে। স্বদেশে তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে আছে যোগ্য পদ। সরকার তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের একজন বিশেষ উপদেষ্টা ক'রে।

কণিকার মনটায় আনন্দ দোলা দিয়ে যায়। কল্পনায় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে সে তার ভাবী গুরুর পায়ে।

এঁর আণ্ডারেই কাজ কোরবে কণিকা। এঁর সুপারিশেই সে ফরেন্ যাবে পড়তে। এঁরই আদর্শে পথ চ'লবে দীপ্ত উষা-আলোকে।

ভাবতেও কেমন লাগে কণিকার। কী ভাগ্যই না তার। বিপদ এসেছে জীবনে বার বার। আঘাতের পর আঘাত যেমন চুরমার ক'রে দিয়েছে তার স্বপ্নকে, তেমনি সৌভাগ্যও আজ তাকে দিচ্ছে ঢেলে ঢেলে আশীর্ব্বাদ। ডাক্তার কাকু, মেজর বোস্, তাঁর প্রিয় ছাত্র—সকলের কাছেই তার মাথা আজ নুয়ে পড়ছে পরম শ্রদ্ধায়। অশেষ কৃতজ্ঞতায়।

আনন্দের আবেগে বন্ধুদের জড়িয়ে ধরেছে কণিকা। বলেছে কত কথা। ব'লে ব'লে শেষ ক'রতে পারেনি।

বন্ধুরা রহস্য করেছে। অপেক্ষা করতে চেয়েছে একটা গোপন পরম লগ্নের শুভাকাঙ্ক্ষিণী হ'তে। গর্ব্ব করেছে অমন বন্ধুর সঙ্গলাভে। আবার ঈর্ষাও করেছে টিপ্পনি কেটে কেউ কেউ।

বুঝেছে কণিকা। কিন্তু সব কিছুতেই সে যেন পেয়েছে এক নীরব গভীর আনন্দ। সৌভাগ্যের শুভ ইঙ্গিৎ। বাবাকে স্মরণ করেছে। মাকে প্রণাম ক'রে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেছে দিনে রাতে।

* *

সময় পেলে কণিকা আজকাল প্রায়ই মেজর বোসের কাছে গিয়ে

বসে। কথা প্রসঙ্গে তার ঐ ছাত্রের কথা ওঠে। কামিং অক্টোবরে যাচ্ছেন রাশিয়ায়। সেখান থেকে ডিসেম্বরে ফিরবেন দেশে। বর্ত্তমানে ইউরোপের সারা কন্টিনেণ্টে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিভিন্ন দেশের মেডিকেল কনফারেন্সে যোগ দিতে হচ্ছে তাঁকে। নতুন প্রবলেম্ নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর নতুন থিওরী। তাই বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসছে তাঁর নতুন তত্ত্বের আলোচনা শোনাতে।

মেজর বোসকে সব লিখে লিখে জানান তিনি। কপি পাঠান বক্তৃতার। ছবিও পাঠান সেই সঙ্গে নানা দেশ বিদেশের।

কণিকা বার বার পড়ে সে সব। ছবিগুলো দিয়ে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে তোলে একটার পর একটা অ্যাল্‌বাম্। মেজর বোসকে আব্দার ক'রে বলে ঃ আচ্ছা কাকু, আপনার ছাত্র বুঝি খুব লাজুক ?

বিস্মিত হয়ে মেজর বোস্ বলেন ঃ কেন ? কি করেছে সে ?

কণিকা ছোট মেয়ের মত বলে ঃ তা নয় তো কি ? সব ছবিই তো পাঠাচ্ছেন ; কিন্তু তাঁর নিজের ছবি ত' একখানাও...

লজ্জায় ভেঙে পড়ে কণিকা। সমাপ্ত ক'রতে পারে না তার বক্তব্যটুকু।

মেজর বোস বুঝতে পারেন তার ভাবার্থ।

হেসে বলেন ঃ ওহো ! বুঝতে পেরেছি। আর বলতে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা ! এবার তাকে তার নিজের একখানা হিরো-বেশের ফটো পাঠাতে লিখে দেব। নিশ্চয় দেব।

—ধ্যাৎ আমি কি তাই বলছি না কি ? আপনি ভারি ইয়ে...

কণিকা সত্যিই মনে মনে চেয়েছিল একখানা ফটো। কথা শুনেছে। কাগজে পড়েছে তার অনেক কথা। শুনেছে বল্লে ভুল হয়। প্রায় মুখস্থই করেছে সব কিছু। কিন্তু দুর্ভাগ্য ; একটা ফটোও দেখতে পায়নি তার আরাধ্য মানুষের।

বন্ধুরাও বলেছে সে কথা। এ্যাল্‌বামের পাতা ওলটাতে তারাও শেষে হয়েছে ধৈর্য্যহারা।

—দূর্ কণি ! তাঁর ফটোটাই পেষ্ট্ করিসনি এতে। তুই কী রে ? ভারি নন্‌সেন্স তো।

কণিকা জানায়নি তাদের। বলেনি সত্যই তিনি নিজের কোন ফটো পাঠান নি তাকে। চাপা হাসিতে রহস্য ক'রে উত্তর দেয় ঃ তোরা দেখছি আরও নন্‌সেন্স। ও-ছবি কেউ বুঝি এ্যাল্‌বামে রাখে ? তাকে পিন্ আপ্ ক'রে রাখতে হয় এইখানে।

কণিকা কথার শেষে ডান হাতটা দিয়ে সবলে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দেয় তার চওড়া বুকটাকে।

ঘর শুদ্ধ সকলে ফেটে পড়ে এক কৌতুক হাসিতে। ছল্ ছলাৎ ক'রে তুলে ওঠে যৌবন ভরা অনেকগুলো বুকের তাজা রক্ত সেদিন। রাঙা হয়ে ওঠে কণিকার কান তুটো হঠাৎ ওভাবে কথাটা বলে ফেলায়। লজ্জায় এ্যাল্‌বাম্‌টা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায় ঘর থেকে ছুটে।

* *

মেজর বোসের গর্ব্ব কণিকাকে নিয়েও। তার ভেতরেও তিনি দেখেছেন এক মধ্যাহ্ন সূর্য্যের দীপ্ত প্রকাশ। উষ্মার আড়ালে বিরাট শক্তির অমেয় স্ফুরণ।

ডাক্তার কাকুকে বলেছেন সব কথা মেজর বোস্।

—দেখ রায়, সি মাষ্ট স্কোর এ্যান্ এক্সেলেন্ট গোল্। আমি বলছি বিশ্বাস কর। এখন থেকেই ওর এমন কিন্ ইণ্টারেষ্ট—এমন নাইস ডিসিসান্ ; সত্যই অপূর্ব্ব।

ডাক্তার কাকুও শুনেছেন কণিকার রিসেণ্ট অপারেশন্ কেশ্‌টার ব্যাপারটা। বলেন ঃ সত্যই স্ট্রেঞ্জ স্যার। আমি নিজে ডাক্তার। কিন্তু এই ছাত্র-অবস্থায় অমন ইন্‌ট্রিকেট্ প্রব্‌লেমের কণিকা যে এমন সুন্দর ডিসিসান্ দেবে—তা' ভাবতে পারিনি। হোল্ স্টাফ অবাক হয়ে গেছে।

কণিকার ফাইনালেরও আর দেরী নেই। দিন রাত ধরে অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে এগিয়ে চলেছে। সেই চপল আমুদে মেয়ের কাছে—এ রূপ যেন বিস্ময়কর।

কতবার কাকু বলেছেন: একটু ফ্রি মুভমেণ্ট নাও কণি। যাওনা কোথাও দু' একটা ট্রিপ দিয়ে এস। অত পরিশ্রমে ভেঙে পড়বে যে।

কণিকা ঘাড় নেড়েছে। বলেছে: না কাকু তুমি কিচ্ছু ভেব না। আমার একটুও ক্লান্তি আসছে না। জানো তো, ষ্ট্যাণ্ড্ ক'রতে না পারলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে আমার। স্টেট্-স্কলারশিপ্ না পেলে কি হবে বল তো? ওঁর আণ্ডারে কাজ ক'রবার যোগ্যতাও থাকবে না।

কাকু এর পর আর কোন কথা বলেননি। অর্থাৎ বলবার সুযোগ পাননি। তিনি জানতেন কণিকা অত পরিশ্রম না করলেও এবারে সেই ফার্স্ট হবে নিঃসন্দেহে। তবু তার উৎসাহে বাধা দেননি। মেজর বোসের মুখে ওর কথা শুনে গর্ব্বে দুলে উঠেছেন। ভেবেছেন সত্যই এক দুর্লভ বস্তুকে রক্ষা ক'রতে পেরেছেন তিনি। কাঁচ ভেবে অবহেলা করেননি হীরের-কণাকে।

প্রতিভাধরদের সুযোগ ভগবান বোধ হয় এমনি করেই এনে দেন। প্রথম প্রথম আগুনে পোড়ান বটে—কিন্তু সে শুধু ওপরের মালিন্যটুকু ঘুচিয়ে শক্ত সবল নিখাদ্ ইস্পাত গড়বার অভিপ্রায়েই।

ভগবানকে প্রণাম জানান ডাক্তার কাকু কৃতজ্ঞতায়। প্রার্থনা জানান নীরব অশ্রুজলে। —ওগো শক্তিময় তুমি ওকে সাহায্য কর। সব সময় সকল অবস্থায় ওর পাশে থেকে ওকে শক্তি দাও।

শুনেছেন ডাক্তার কাকু মেজর বোসই অবনীর আণ্ডারে কণিকে কাজ ক'রবার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। অবনী শিল্পীর দেশে ফিরছে। অতবড় স্কলার ভারতবর্ষে কটাই বা আছে? এত অল্প বয়সে সে যে কাজ করেছে. তাতে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

ডাক্তার কাকুর কত যে আনন্দ তা বুঝিয়ে বলতে পারেন না।

কণিকা তার কাছে করবে রিসার্চ। অবনীর গাইডেন্সই তার সাধনাকে এগিয়ে দেবে সার্থকতার পথে।

* *

কণিকার কথা মেজর বোস্ এক সময়ে জানিয়েছেন অবনীকে। শুনেছে বিদেশে বসে অবনী কণিকার অনেক কথা। হয়ত বিরাট কাজের একটু নীরব অবসরে কল্পনা করেছে তাকে মুগ্ধ হৃদয়ে।

আজকাল চিঠির মধ্যে অনেক কাজের কথার ভিড়ে একটু করে প্রায়ই জায়গা জুড়ে থাকত কণিকা। পড়তোও অবনী তা কৌতুকে। কাজ আর কর্ত্তব্যের নিরলস সফেন সমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট এক টুকরো দ্বীপের মতই যেন সে-অংশটা।

লজ্জায় রাঙা হয়ে গিয়েছিল কণিকার ফুটন্ত মুখখানা। কথা বলতে পারেনি। শুধু মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়েছিল মেজর বোসের কথায় সেদিন।

অবনীর অনেক চিঠির মধ্যে একটা নতুন চিঠি এসেছিল। দেশ বিদেশের নানা খবর আর গবেষণার আলোচনায় ভরা লম্বা চিঠি সেটা নয়। সুন্দর হাতের কটা বাংলা হরফ্। শিল্পীর রঙ্-জলে আঁকা যেন এক টুকরো রামধনু।

মেজর বোস্ চাপা হাসিতে সেটা আগ্রহভরে এগিয়ে দিয়েছিলেন কণিকা আসতেই। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সেটা পেয়ে কণিকা। দেহটা তার কেঁপে উঠেছিল এক অব্যক্ত রোমাঞ্চে সেদিন।

এই প্রথম—সর্ব প্রথম ভাবী-গুরুর আশীর্ব্বাদ পেল কণিকা। শুধু কল্পনায় এতদিন যে জাল বুনে এসেছে—আজ তারই বাস্তব ছায়ারূপ দেখতে পেল। পুরো চিঠি নয়। বড় চিঠির একটা ছোট অংশ। শতদলের একটা দল্ মাত্র।

কিন্তু কি লিখেছেন তিনি? কি আছে এতে? কেমন সম্বোধন

করেছেন তাকে ? রূপ-কথার সে অচিন রাজকুমার সত্যই কি তা'হলে আনলো কোন পরশকাঠি এতদিনে ?

কি সন্দেশ এনেছে এই পত্রদূত ? চির-খুশীতে ভরা কোন্ স্বপ্ন-রঙিন মায়া-বনের ইঙ্গিত আছে এর মধ্যে ? সত্যই কি এতে মৃত-কণি পাবে নতুন ক'রে বাঁচবার সঞ্জিবনী ?

চিঠির ভাঁজ খোলবার আগে মাথায় ঠেকায় কণিকা সেটা গভীর শ্রদ্ধায়। নিঃশব্দ আবেগে কতক্ষণ চেপে থাকে তার দুলে-ওঠা বুকটায়। আবার অনেক দিন পরে কণিকার নিটোল কপোল দুটো উঠল চিক্ চিক্ ক'রে। মুক্তোর মতন দু'ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল অলস ভাবে অতি সঙ্কোচে।

* * *

মেজর বোস্ সত্যি কোন কথা লুকোননি অবনীকে। কণিকার সম্বন্ধে সবই লিখেছেন তাকে। প্রশংসার এতটুকু ফাঁক রাখেননি কোথাও।

কী লজ্জা ! পড়তে পড়তে শিউরে ওঠে কণিকা। ছিঃ ছিঃ। অত বড় দেবতার কাছে পূজারিণীর একি অসহায় দীন নগ্নতা ? তা না হলে তিনি জানলেন কি করে সব ?

কলেজেতে তার দক্ষতা,—তার জীবনের এ্যাম্বিশান্, তার রূপ, ব্যবহারের মুগ্ধতা—সব, সব জেনেছেন তিনি। তাই কোন কথার ইঙ্গিত করতে ভোলেননি চিঠিতে।

হয়ত হেসেছেন। সে সমস্ত কাহিনী সরিয়ে রেখেছেন সময়ের অপব্যয় না ক'রে। বিরাট কাজের লোক অবনী। হয়ত এত তুচ্ছ কথা শুনে কিছুক্ষণের জন্য চিন্তিত হ'য়ে সঙ্কুচিতই হয়েছেন মনে মনে।

কিন্তু সত্যই কি তাই ? কণিকা আবেশে যেন হারিয়ে ফেলে নিজেকে। সত্যই কি তিনি এতখানি তার সম্বন্ধে উদাসীন ? তা'হলে

এত কথা লিখলেন কি ক'রে ? এমন আশা ভরা দীপ্ত আশ্বাসে কেমন ক'রে ভরিয়ে তুলতে চাইলেন কণিকার অতি ছোট্ট ভীরু বুকখানাকে।

এ তো কাজের ভীড়ে ব্যস্ত থাকার কথা নয়। মধুর অবসরের আবেগ ভরা কল-কথা। নন্দিত প্রাণের এ-যে এক অশেষ প্রীতি। মুগ্ধের অব্যক্ত মাধুর্য্য।

আনন্দে নিজে থেকে অবনী কণিকাকে জানিয়েছে—আমার গাইডিংএ তোমার রিসার্চ ক'রবার সুযোগ করে দিলে আমি নিজেও সুখী হব। তুমি মেজর বোসের প্রিয় পাত্রী। এইটাই আমার কাছে তোমার বড় পরিচয়।

শুধু কি তাই ? শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন সেই সঙ্গে মুগ্ধ ভক্তের কৃতিত্ব-সাফল্যে। আর প্রীতি জানিয়েছেন আশাতীত ভাবে তাঁর নিজের একটা সুন্দর প্রতিকৃতি পাঠিয়ে। যার পেছনে তাঁর স্বাক্ষরের সঙ্গে ছিল একটা মধুময় ছত্র—"To my unknown well-wisher."

অভিভূত কণিকা উচ্ছলতায় ভেঙে পড়েনি এই দিন। পাতাল-পুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার মতই এক মুগ্ধ যাদু-মন্ত্রে হ'য়ে গিয়েছিল স্বপ্নাচ্ছন্ন। যার রঙীন নেশায় মত্ত হয়ে শুধু দেখ্‌ছিলো, কে এক রাজকুমার যেন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে ভেসে আসছে সুদূর আকাশ-পথ বেয়ে। হাতে তার সোনার কাঠি। বুকে তার মোতির মালা।

* *

এক আকাশ তারা। কিন্তু চাঁদ একটা। আলো বিলোয় এ ওকে। পৃথিবী পায় দু'জনকেই। দু'জনাই তার রাতের সহচরী। একটি কৌতুকে ভরা। শুধু চেয়ে থাকে, আর হাসে মিটি মিটি। আর একটি রহস্যময়ী। কখনও উচ্ছলতার উদ্দামে মাতিয়ে দেয় আলোর বন্যা এনে। আবার কখনও ভরিয়ে দেয় বিষাদে।

কুঁক্‌ড়ে কুঁক্‌ড়ে ঢেকে ফেলে সমস্ত দেহটাকে কালো-চাদরের নিস্তরঙ্গ আবরণে।

মলিন হয় সখীর দুঃখে যামিনী-ধরা। বিগলিত হৃদয়ে দুলে ওঠে তার কতই না না-ভোলা স্মৃতি-কণা। কাজল কালো চোখে দেখে কতই না আরো কালো দুঃস্বপ্ন। সেও অমারাত্রি যাপন ক'রে চলে। ব্রতচারিণী হয়। দীপ জ্বালে না একটাও। যেন ভাবে—থাক্ থাক্; আজকে সবকিছুই ঢেকে থাক্ আঁধারে। হয়ত বা ভালই লাগে। আলোয়-ভরা দিনের মধ্যে এক-একটা কালো রাত, মন্দ কি?

কাঁদে কণিকা। কাঁদে একলা। নিঃসঙ্গ ঘরে একলাই কাঁদে সে আজ। এ কান্না দুঃখের নয়। চাপা দীর্ঘশ্বাস ভরা শোকাতুর প্রাণের নয় কোন অস্থির উন্মথন।

কাঁদে আনন্দে। পোড়া ভাগ্যের সুখ শান্তিতে। একটু নীরব হয়ে ভাবে। মোহিত হয়ে ভাবে তার সৌভাগ্য নিয়ে। বার বার স্মৃতিতে জাগে মা-বাবার কথা। মনে পড়ে পিছু টানের ছায়া-ঘেরা কয়েকটা মুখ।

চিঠি খোলে। আবার পড়ে। কিন্তু কেবলই ঝাপসা হয়ে যায় অক্ষরগুলো। মিশে মিশে যায় মিশ্‌কালো রং সব। মিশিয়ে যায় কালো রাতের ঐ কালো অন্ধকারে। তবু কালোকেই কণিকার ভাল লাগে আজ। আলোয় ওঠে না ফুটে তার নিজেরও কাজল-গোলা সজল রেখা কপোল-তটে।

উত্তর চেয়েছে অবনী। শুনতে চেয়েছে অনেক কিছু পরের চিঠিতে। মেজর বোস্ তো জানিয়েছেন অনেক কথা। তবু আরও চাই।

কি লিখবে কণিকা? কি জানাবে তার অ-দেখা দেবতাকে? কী করেই বা বলবে সে—কী সে? কি তার পরিচয়?

ভেবেছিল কত কথা। লিখেছিল আবেগে কত পাতা। শোনাতে চেয়েছিল কত কাহিনী। আবেগ-মথিত প্রাণের কতই না মধুর রাগিণী।

দেখিয়েছিল পরে একান্ত বন্ধুদের সে লেখা। আনন্দে ফেটে প'ড়েছিল কেউ। কেউ বা গোপন ঈর্ষায় ফেলেছিল চাপা দীর্ঘশ্বাস।

—হ্যাঁরে, এ যে একেবারে কাব্য করেছিস। বুঝবে তো বৈজ্ঞানিক মশাই ?

এক বন্ধুর এ রহস্যে হেসে ফেলে কণিকা : না বোঝে হাতের কাছে মাইক্রোশ-কোপের তো আর অভাব নেই। তা'ছাড়া দু'এক ছড়া কবিতা যার হাত দিয়ে বেরোয়, নারী মনের সাইকোলজি তার নিশ্চয় জানা আছে।

—তা আছে। নারীদেহও তার নখের ডগায়। বিশেষ ক'রে যখন আবার ডাক্তার। তাহলে আর এ-কাব্যের মূল্য কি ?

মন্তব্য ক'রে জোরে হেসে উঠেছিল বন্ধুটি লঘু চপলতায়।

কণিকাও হেসেছিল সে কথায়। সত্যই তো, কি অর্থ আছে এই কাব্যের ? একি ভাল ? কোন কি মূল্য দেবেন কাজ-পাগল গুরু তার ? হয়ত বুঝবে না যথার্থ অর্থ এর। শুধু কৌতূহলই সার। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই যাঁর সবকিছু, ছোট্ট একটা প্রাণের দব্‌দবানি, মনের অবুঝ্‌ অব্যক্ত ভাব ধরা পড়বে কি তাঁর মগজে ?

চিঠিটা আবার পড়ে কণিকা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আওড়ে যায় কথাগুলো। জীবনে সে এত মিষ্টি চিঠি বোধহয় আর কাউকে লেখেনি। যাকে দেখেনি কখনো, পায়নি যার হৃদয়ের কোন পরশ কোন মুহূর্ত্তে, তাকে এইভাবে চিঠি দিতে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার দেহ মন।

অনেক কিছু জানার ভেতর কণিকা বুঝেছে অবনীর চিঠির মর্ম্মার্থ। মেজর বোসের কাছ থেকে সব খবর অবনী জেনেছে কণিকার সম্বন্ধে। কিন্তু সে শুধু বাইরের পরিচয়। বৈজ্ঞানিক ডাক্তার অতটুকুতে থেমেছেন কই ? তাঁর মন প্রাণ সজাগ হয়েছে সে-বস্তুর বিশ্লেষণ করতে।

জানতে চেয়েছে কণিকার নিজের কথা। চটুল প্রশ্নে আঘাত দিতে

চেয়েছে অ-দেখা মরমীয়ার মন-বীণায়। বলেছে এবার প্রতিদান চাই। পাঠিয়ে দিও তোমার ফটোটা পরের 'মেলে'।

এ চিঠি আর মেজর বোসের চিঠির অংশটুকু নয়। তারই নামে, তারই ঠিকানায় এসে তাকে দোলা দিয়ে অস্থির করে তুলেছে।

পালটা চিঠির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে পাল্‌টে গেছে তার সম্বোধনের সুর। তার 'ইতি' বলে স্বাক্ষরের প্রীতিটানটুকুও বদলে গেছে দিনে দিনে।

কণিকাও পালটেছে। সম্বোধনের সুর পালটাতে গিয়ে থম্‌কে গেছে বারবার। লিখতে গিয়ে পেনের কালি আরও কালো ক'রে দিয়েছে পাতাটা। তবু না-লেখার লোভ সামলাতে পারেনি সে। 'ইতি'র আগে প্রণাম শব্দের বদলে 'প্রীতি' এসেছে। দেশ-বিদেশের কথা, আর গবেষণার কাহিনী ছিল না এ পত্রের বিষয় বস্তু। অজানাকে জানা—অচেনাকে চেনা, দু'জনের কূজনে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল এ পত্র-পাতা। সবুজ হয়ে উঠেছিল তার রং।

* *

অবনীর ফটো কণিকা কেবল প্রিয়বন্ধু লতাকেই দেখিয়েছিল। লতা তার বন্ধু-শ্রেষ্ঠ। অবাক নয়—তন্ময় হয়ে গিয়েছিল ব্যারিষ্টার কন্যা লতা মিত্তির। আবেগে কণিকাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল : হাউ লাকি তুই কনি ? সত্যই ভাগ্যবতী। দেখ্ দেখ্ কি লাভলি মুখ। কী গাম্ভীর্য ভরা তীক্ষ দৃষ্টি। সত্যই কনি, তোকে দেখে হিংসে হয়। লাকি এন্‌আফ্।

কেঁপে উঠেছিল কণিকা। কোন্ এক অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠেছিল। কাউকে আর দেখায়নি সে ফটোখানা। অবনী বলেছিল এইটাই তার জীবনে নিজের তাগিদে তোলা প্রথম ছবি।

অবনীকে লিখেছিল কণিকা—এর কপি সে যেন আর কাউকে না

দেয় কখনও। হেসেছিল অবনী। উত্তরে লিখেছে: ওটা কেবল তোমারই থাক্। আর তোমারটাও যেন কেবল আমারই থাকে।

অনেক ভেবেও কণিকা শেষ পর্য্যন্ত কথা না রেখে থাকতে পারেনি। লজ্জায় সঙ্কোচ এসেছিল। তবু না পাঠিয়ে পারেনি ফটোখানা।

অতবড় ডাক্তার—অতবড় পণ্ডিত, তবু কত সহজ সরল আমুদে। কি মিষ্টি করেই না কথা বলতে পারে। কত কৌতুক করেই না পাঠায় প্রত্যুত্তর। মেজর বোসও কণিকাকে বলেছিল সে কথা: জানিস মা, অবনী যে অতবড় হয়েছে—এ কথা তার মুখ থেকে কোনদিনও শুনতে পাবি না। লাজুক নয় সে। স্বভাবজাত বিনয়েরই এটা প্রকাশ।

কণিকার গর্ব হলেও খুব বেশী আগ্রহ দেখায়নি এ কথায়। উদাসীন ভাবে তাকিয়েছিল অন্যদিকে। মেজর বোস্ হেসে বলেছিলেন আবার: জানিস মা, সব যথার্থ পণ্ডিতই এইরকম। ওদের ব্যবহারে আর কথায় পাণ্ডিত্যের বাহুল্য থাকে না। কাজের মধ্যে দিয়েই ওদের চেনা যায়। বোঝা যায় কত বড় ওরা।

মেজর বোসের শিষ্য-প্রশস্তিতে হাসি পায় কণিকার। ভাবে, ছাই। পণ্ডিত না আরো কিছু। ভারি দুষ্টু। এবারে যা লিখেছে তাকে!

সত্যি কি দুষ্টুই না অবনী। চিঠির কথাটা যখনই মনে পড়ছে রোমাঞ্চে কেপে উঠছে সে। এত দুষ্টুমি কখন শিখলো সে? বৈজ্ঞানিক বাবুর মন এত অপল্‌কা? তারা না যোগী? কণিকাও কড়া জবাব দিয়েছে একটা। সেই সংগে বলে দিয়েছে—তাড়াতাড়ি দেশে এবার না ফিরলে নিশ্চয় সব বলে দেবে মেজর কাকুকে।

* * *

আজ দীর্ঘ দিন হল অবনী রয়েছে বিদেশে। ডাক্তারি পড়তে গিয়ে সেখানেই থেকে যায় কয়েক বছর। তারপর থেকে সারা পাশ্চাত্য

ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথা ছিল রাশিয়া থেকে ফিরেই দেশে চলে আসবে সে। কিন্তু তা আর হ'ল না। আবার চললো জার্মাণী। তারপর তাকে আবার পাড়ি দিতে হবে আমেরিকায়।

কণিকা দিন গুণছিল। এক একটি দিন তার কাছে মনে হচ্ছিল যেন এক একটি বছর। মেজর বোসও আশা দিয়েছিলেন অবনী শীঘ্রই ফিরে আসছে।

ইতিমধ্যে কণিকার ফাইনালও শেষ হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার কাকু বলেছিলেন—ভালই হল কণি, তোকে আর কষ্ট ক'রে অবনীর পিছু পিছু দৌড়তে হবে না। সে নিজেই আসছে চলে।

কণিকার মন ভরে উঠেছিল উৎসাহে। কিন্তু যখন চিঠি পেল, ব্যথায় ভরে গেল মন তার। অভিমানে উত্তর দেয়নি কণিকা অনেকদিন অবনীকে। ডাঃ কাকুকে বলেছিলঃ অত্যন্ত বাজে লোক। কথার ঠিক থাকে না এতটুকু। ওঁর কাছে কাজ আমি কোরব না। অভিমানে আর ব্যথায় কণিকার গলা চেপে এসেছিল।

ডাক্তার কাকু বুঝেছিলেন এ তার নিছক অভিমান। সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ ছিঃ মা। রাগ করিস কেন? ওকি যে-সে লোক? দেখছিস না দেশে দেশে ওর কত খ্যাতি। আমন্ত্রণ করলে ওর পক্ষে 'না' করাটা যে অশোভন। এতে তোরও গৌরব বোধ করা উচিত। তুই যে তার শুভাকাঙ্খিণী।

অভিমানই করেছিল কণিকা। তাকে চিঠিতে অবনী সান্ত্বনা দিয়েছিল। বলেছিল সমস্ত ব্যাপারটা খুলে। একেবারেই অপারগ সে বর্ত্তমানে দেশে ফিরতে। লিখেছেঃ লক্ষীটি রাগ কোর না, তুমি দুঃখ করলে আমি নিজেও কষ্ট পাব। তোমার মনের তারের সঙ্গে আমার মনের তার যে এখন একসুরে বাঁধা।

সজল হয়ে উঠেছিলো কণিকার চোখের পাতাগুলো। অভিমান বিরহ সব ভুলেছিল ডাক্তার কাকুর কথায়। 'তুই যে ওর শুভাকাঙ্খিণী' কাকুর মন্তব্যে তার চোখে বয়েছিলো আনন্দের অশ্রু। ভেবেছিল—

সত্যই কি শুভাকাঙ্খিণী হবার যোগ্যতা অবনী তাকে দিয়েছে। এতে কি তারও গৌরব নয়? অবনী যে লিখেছে—তাদের দুজনার মন একসুরে বাঁধা,—একি মিথ্যে?

তবু কণিকার দুঃখ যায়নি। অবনীকে সে লিখেছে সে যেন আর দূরে না থাকে। চলে আসে তাড়াতাড়ি। বিরহে পুড়ে অনেক কিছু আরও লিখতে গিয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার কাকুর কথা মনে পড়ায় আর লিখতে পারেনি।

সত্যি অনিচ্ছায় নয়, কাজের চাপেই অবনীর দেশে ফেরা সম্ভব হয়নি। হয়তো খুব শীঘ্রও হবে কিনা সন্দেহ।

কণিকার জন্য তার মন খারাপ। পত্র দিতে দেরী হলে তারও আজকাল কেমন যেন অভিমান হয়। অবসরে কেবলই সেই ফটোর মুখখানা বিষাদে ভরিয়ে দেয় মন তার।

দেখেনি এখনও কেউ কাউকে। মেজর বোসের কাছে যা শুনেছে তাই তাদের পাথেয়। চিঠির মাধ্যমে তাদের পরস্পরের যা সম্বন্ধ। দু'জনই উভয়ের কাছে রহস্যময়। তবু দু'জনই দু'জনার জন্য উন্মুখ।

কণিকা ভাবে। কী মজার না তাদের এই পরিচয়। গল্পকথার নায়ক-নায়িকা তারা। দু'জনে রয়েছে অপরিচয়ের অন্ধকারে। তবু কত চেনা। কত মধুর হৃদয় দেওয়া নেওয়া। রহস্য নয়তো কি? কে এই অবনী? কোথাকার লোক? কি তার যথার্থ পরিচয়? কিছুই জানা হয়নি কণিকার।

তিনিই বা কতটুকু জানেন কণিকার সম্বন্ধে? শুনেছেন কি তার পূর্ব্ব-পরিচয়? জানেন কি কত অভিশপ্ত জীবন তাঁর অদেখা-মানসীর?

—শুধু চিঠি? কেবল দুটো ফটো; সত্যি?

কণিকার সম্বন্ধে লতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো কৃষ্ণা।

—হ্যাঁরে হ্যাঁ। ঠিক তাই। এখনো পরস্পরের দেখা তো দূরের কথা; দু'জনে ভালো করে দু'জনের পরিচয়ই জানে না।

—তবে এতো ভাব জমলো কি করে?

—জমলো কি রে ? বল্ জমাট বেঁধে গেছে।

হাসিতে লুটিয়ে পড়ে লতা কৃষ্ণার গলাটা জড়িয়ে। বলে ঃ সেইটাই তো রহস্য। আমিও কি ভালো করে জানি ছাই যে ওদের আসল ব্যাপারটা কি ?

শুধু লতা কেন, এ রহস্য তো কণিকার নিজেরও। শুধু চিঠি। শুধু দুটো ফটোই তাদের ধীরে ধীরে বাঁধন দিয়েছে। কাছে নেই কেউ কারুর। কত সুদীর্ঘ ব্যবধান। তবু এ কেমন বাঁধন দু'জনার ? এ কী মন্ত্র—তাদের পরস্পরের মন জানাজানির ?

কণিকা ফিরে তাকায় নিজের দিকে। চেয়ে দেখে জীবনের ফেলে আসা পদচিহ্নের দিকে। চমকে ওঠে ভয়ে। সংশয়ে দোলা লাগে আনন্দ- ভরা বুকখানায়।

আবার বাঁধন ? আবার সেই পোড়া ভালবাসার নগ্ন উন্মথন ? সেই ধরা পড়ার প্রবণতা ? আঁকড়ে ধরে রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা ?

আপন মনে শিউরে ওঠে কণিকা। ভগবান এ আবার কেমন ফাঁদ পাততে চলেছেন তাকে নিয়ে ? আবার সেই পুরানো মান অভিমান, প্রীতি, ভালোবাসা। ছায়াছবির মধ্যে সত্যকার রক্ত-মাংস মানুষের হাসি কান্না শোনার ভোজবাজী। আবার পত্র লেখা ! মন বাঁধা আর একটা মনের সঙ্গে।

বিভ্রান্ত হয়ে যায় কণিকা। হু হু ক'রে কেঁদে মুখ গোঁজে বালিশের মধ্যে। উন্মাদের মতন চাপা কান্নায় বলে ওঠে—না, না। আর ছেড়ে দেবো না। বার বার আর তোমাদের অমন করে পালাতে দেবো না ফাঁকি দিয়ে। আর নিঃস্ব হয়ে কাঙাল সাজতে পারবে না কণি। কিছুতেই না। আসুক বাধা। সর্ব্বস্ব দিয়ে রুখে দাঁড়াবে সে। কিছুতেই ছিঁড়তে দেবে না তাদের এ বাঁধনকে আর।

* * *

অবনী কণিকাকে জানে না ভাল করে। দেখেনি এখনও চাক্ষুস ভাবে। তবু কাছে টেনেছে। বিশ্বাস করেছে মেজর বোসের সব কথায়। গর্ব অনুভব করেছে তার কৃতিত্বে। শুভেচ্ছা জানিয়েছে তার সাফল্যে।

কণিকা তাকে দেখেছিলো অন্য চোখে। কল্পনাও করেনি কখনো তার সাহচর্য্য পাবে এমন ভাবে। নিজের অবস্থার কথা স্মরণ ক'রে মনের কথা খুলে বলতে গিয়েও তার কলম সরেনি।

অবনীর সরলতায় কণিকা স্তম্ভিত হলেও, সংযত করেছে নিজেকে। প্রশ্রয় দেয়নি নিজের উচ্ছলতাকে। বিচলিত হয়েছে বার বার। তবু নারী মনের সে দৈন্য প্রকাশ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

অবনী এগিয়ে এসেছে প্রথমে। সেই সুর পালটেছে চিঠির সম্বোধনের। আগে সেই প্রকাশ ক'রে ফেলেছে পুরুষ হৃদয়ের স্বাভাবিক ঔৎসুক্যকে। কণিকার ইচ্ছায় সহৃদয় মনে পাঠিয়েছে তার প্রতিকৃতি। শুধু কি তাই ? মেজর বোসের মনেও তার দুর্ব্বলতাকে করেছে সহজ প্রশস্ত।

কণিকা অভিভূত হয়েছে। ভয়ে, লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। তবু তার মতন অসন্দিগ্ধ দ্বিধাশূন্য মন নিয়ে থাকতে পাচ্ছে কৈ ? অতীতের অভিশপ্ত কী এক দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত বাতাস শুকিয়ে দিচ্ছে তার কণ্ঠতালু। কুঁকড়ে উঠছে তার অন্তরাত্মা মুহুর্মুহু।

সজল নয়নে বার বার ভেসে ওঠে বিগত দিনের ব্যথাভরা স্মৃতিগুলো। প্রতি পদক্ষেপে বাধা দিয়েছে আর এগুতে। তবু শেষ-পর্য্যন্ত কণিকা সাড়া না দিয়ে পারেনি।

—এতটা বোধ হয় ভাল হচ্ছে না কণি।

—তুই কি ভাবিস, আমিই কেবল বুঝি জট্ পাকাচ্ছি ?

—তা নয়। তবে মেজর বোস্ যদি জানেন তো অসন্তুষ্ট হবেন। তা'ছাড়া সামনে তোর একটা বিরাট দায়িত্ব।

লতার মন্তব্যে গম্ভীর হয়ে যায় কণিকা। বলে ঃ তিনিই তো সব মাটি ক'রে দিয়েছেন প্রথমে। অবনীকে আমার সম্বন্ধে তিনিই তো প্রশ্রয়

দিয়েছেন। আর যে দায়িত্বের কথা বলছিস—তারও তো শেষ পরিণাম সেই ওঁরই হাতে। আমিই এখন জালে বদ্ধ।

কথার শেষে ধরে আসে কণিকার গলাটা ব্যথা-ভরা অভিমানে। নিজের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সে সচেতন। তবু লতার কটাক্ষে বিষিয়ে ওঠে মন তার।

লতা বুঝতে পারে বন্ধুর ব্যথা। তাই কথার মোড় পালটায় অন্য কথা পেড়ে। রহস্ত করে অবনীকে নিয়ে। কিন্তু সহজে কণিকার মন আজ দুলে ওঠে না আর। ভাবে, হয়তো কেন? সত্যইতো সেও অবনীকে ঘিরে রচনা করেছে ভালবাসার এক মধু-জাল। গানের তালে অবনীর মতন সেও তো সুর বেঁধেছে এক তারে। উড়িয়েছে হৃদয়ের মধুবনে প্রেমের রঙীন পতাকা।

লতার কথা মনে পড়ে কণিকার। সে বলেছে কণিকা 'লাকি'। অবনীর ফটোটা বুকের কাছে ধরে নিবিড় ভাবে তাকিয়েছিলো অনেকক্ষণ। শেষে বলেছিলো একটা কথা আবেগের সুরে—'লাভলি'।

কণিকা তারপর আর ওটা দেখাতে পারেনি কাউকে। ডাক্তার কাকু তারিফ্ করেছিলেন ঃ সত্যই ভগবানের বরপুত্র অবনী। যেমন গুণ, তেমনই কোমলতায় ভরা সুশ্রী চেহারা। কে বলবে, কালা আদমির-দেশের ছেলে।

হেসে ফেলেছিলো কণিকা কাকুর কথা শুনে। মুখ বেঁকিয়ে বলেছিলো ঃ ভারিতো মুখ। অমন রূপ অনেকের আছে।

—তা আছে হয় তো। কিন্তু অমন গুণে ভরা রূপ কটা লোকের আছে বলতে পারিস? তোর অবনী কি যে সে লোক একটা?

গর্ব্বে কণিকার বুকটা দপ-দপিয়ে উঠেছিল সেদিন। সারা রাত ধরে মধুপের গুঞ্জরণের মতন—'তোর-অবনী' কথাটা সুর তুলেছিলো তার কানে।

'তোর-অবনী'। বার বার ও কথার স্বগত আবৃত্তিতে দুলে উঠেছিল সমস্ত মন প্রাণ কণিকার।

'তোর অবনী'? ছিঃ ছিঃ। কাকুর যেন মুখের একটু আক্-ঢাক্ নেই। যদি কেউ শুনতে পেতো?

আবেগে সে কথা চাপতে পারেনি নিজে। বলে ফেলেছিলো লতার কাছে। কিন্তু দুষ্টু লতাটা কি কম? গলা জড়িয়ে কণিকার কানে মুখ এনে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলো: হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোরই অবনী। তোরই অবনী। বাব্বা! ঢের ঢের লাভার দেখেছি। এমন অপলকা ফুলিশ-লাভার কোথাও দেখিনি। তাঁকে একটা 'টেলি' করে দেবো। যেন কোন বন্ধুকে দিয়ে তাঁর কানেও হাজার বার বলিয়ে নেয়—'তোর-কণি', 'তোর কণি'।

হাসির হুল্লোড়ে ফেটে পড়ে দু'জনা। ধ্যাৎ—বলে কণিকা লতার পিঠে চাপড় দিয়ে পালিয়ে যায় ছুটে।

* * *

দেখতে দেখতে এর পর কেটে যায় দু'দুটো বছর। পূব থেকে পশ্চিমে ক্লান্ত পৃথিবীরাণী বছরে বছরে এক একটা মালা দিয়ে ঘের দেয় সূর্য্যদেবকে। একটা ক'রে মালা গাঁথা শেষ হলো, আবার নূতন ক'রে ঘের টেনে চলে।

কে জানে এই মালা-গাঁথা শেষ হবে কবে? কবে সূর্য্যদেব প্রীতি-ভরে অচ্ছেদ আলিঙ্গনে বদ্ধ করবে মালিনীকে তাঁর? ভাবে, হয়তো এ-আশা কোন দিনই সফল হবে না। হয়তো কোন কালেই আসবে না সে শুভ লগ্ন জীবনে। অনিশ্চিত ভাবে তবু চলে মেদিনী। হয় ব্রতচারিণী। সাধনা থামে না এতটুকু।

শুধু পৃথিবী কেন? তার মতন তার প্রিয়-সৃষ্টি মানুষ-কণিকাও তো চলেছে সে-সাধনার পথে। সেও তো হয়েছে ব্রতচারিণী। এ-চলা অনন্ত কাল ধরে অনন্তের পথেই চলা। আশা-দীপ হাতে সার্থকতার বিজয়-পথে সকলেই তো অভিযাত্রী। শুধু চাওয়ার তাগিদে কেবল

এগিয়ে চলা ঘুরে ঘুরে। দিন আর রাত্রির মতন হাসি আর অশ্রু নিয়ে কেবলই সাজিয়ে চলা জীবনের অর্ঘ্য-থালা। নিরন্তর পূজা। কেবলই প্রার্থনা। পাওয়া নয়—চরম চাওয়া। যার শেষ নেই। নেই বলেই এ চাওয়া অশেষ্। এ-চলা অক্লেশ।

কণিকাও চলে তার অনির্ব্বাণ আশা-দীপ হাতে। ক্লান্ত-চরণে আসে অবসাদ। মাঝে মাঝে মন হয় অসহায়। তবু থামে না। চলে এগিয়ে। চলার মধ্যেই পাওয়ার আনন্দ করে উপভোগ।

অবনীর পথ চেয়ে বসেছিল কণিকা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার আসা হলো না। ঠিক হয়েছে কণিকাই তার কাছে যাবে। ওখানে থেকেই তার আণ্ডারে কাজ ক'রে সাবমিট করবে তার থিসিস্।

ফরেন্ কণিকা যেতই। ডাক্তার কাকুই তাকে পাঠাবার সব ঠিক করেছিলেন। তাই অবনীর পত্র পেয়ে তিনি যেন হাতে চাঁদ পেলেন। অবনী কণিকাকে পাঠিয়েই দিতে লিখেছে।

মেজর বোস্‌ও এতে সম্মতি দেনঃ অবনীর নির্ভয় আশ্রয় কণিকা যদি পায়—সে তো ওর ভাগ্যই। তা'ছাড়া ওর ও যখন এতে আপত্তি নেই।

কণিকার মত তার বন্ধুরাও এ সুখবর শুনলো। ফাইনালে ভাল রেসাল্ট্ ক'রে স্টেট্-স্কলারসিপ পেয়েছে সে। সকলেই জানতো সে ফরেন্ যাবে। তবে এর সঙ্গে আরও একটা যে রোমান্স জড়িয়ে আছে—তাতেই তার আনন্দ সবচেয়ে বেশী।

কণিকার আসল আনন্দও ঐ সূত্রে। লতাকে বলেঃ শুনেছিস আমি অবনীবাবুরই ওখানে যাচ্ছি?

লতা চাপা হাসিতে ঝেঁঝিয়ে উঠেঃ এ আবার এমন নতুন কি? ফুল আর অলি কবে আর ছাড়াছাড়ি করে থাকে?

লতার চুলের বিনুনীটা পাকিয়ে ধরে কণিকাঃ নন্‌সেন্‌স্। তোর মনে কেবল ঐ সব চিন্তা। বয়ে গেছে আমার ওর কাছে যাবার। আমি যাচ্ছি নিজের কাজ গুছোতে।

—নিশ্চয়! স্বপ্না মুখ গম্ভীর করে লতার দিকে তাকায়। —তুই সত্যিই লতা একটু ইয়ে। কণিকা আমাদের তেমন মেয়েই নয়। ও দেখবি কেমন সত্যিকার কাজ গুছিয়ে নেয়। কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না। শুধু পদবিটা যাবে পাল্টে। নারে কণি?

রেগে কণিকা কি যেন বলতে যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তেই কাকুকে দেখে সবাই থমকে যায়। কণিকাও নিস্তার পায় বন্ধুদের হাত থেকে।

কাকুর মতন মেজর বোসকেও আশ্বস্ত করেছে কণিকা।—দেখবেন নিশ্চয় ডিউ-টাইমের ভেতরে আমি ডক্টরেট্ পাবো কাকু। আশির্ব্বাদ জানিয়েছেন তাকে মেজর বোস্। সত্যি তাঁরও আজ গর্ব্ব কম নয়। যে কণিকাকে একদিন ছোট বেলায় দেখে তাঁর মনে আশা জেগেছিল—সেই কণিই যে আজ ফরেন্ যাচ্ছে ডক্টরেট্ নিতে, এতো পরম আনন্দের বিষয়। বন্ধুরাও একের পর এক এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেছে কণিকাকে।

যাবার দিন স্থির হয়ে গেছে কণিকার। আগামী সোমবার তার প্লেন ছাড়বে। কণির এ-যাত্রা পরম সুখের হলেও লতা আর কাকু কেমন যেন ভেঙে পড়েছে। একজনের বুকে প্রিয় বন্ধুর বিচ্ছেদ-ব্যথা, আর একজনের মনে কণ্ব-পিতার দাবাগ্নি।

যাবার লগ্নে কণিকাও স্থির থাকতে পারেনি এক মুহূর্ত। বার বার চাপা কান্নায় জড়িয়ে ধরলো লতাকে—বারবার কাকুর বুকখানা ভিজিয়ে দিলো তপ্ত-জলে। এত সুদূর যাত্রা জীবনে এই তার প্রথম। এমন মধুর-শুভ-লগ্ন এই তার ভাগ্যে প্রথম। তবু এত ব্যথা—এমন কান্না কেন? চমকে ওঠে কণিকা ক্ষণে ক্ষণে। বুঝতে পারে না কী যেন এক অজানা আশঙ্কা দুলিয়ে দেয় তার ছোট্ট বুকখানাকে। অবশ করে দেয় তার সহজ চলচ্ছক্তিকে। জোড় হাত তুলে স্মরণ করে ভগবানকে সে। কাকুর সঙ্গে একসুরে বলে ওঠে—শক্তি দাও দেব, রক্ষা কর হে জগন্নাথ।

এর কিছুক্ষণ পরেই প্লেন ছেড়ে দেয় কণিকাদের। যতদূর দৃষ্টি যায় স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকেন কাকু সেই দিকে। দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায় কণিকারা নীল আকাশের এক কোণে। কাকু লতার সঙ্গে ফিরে আসেন সাঁঝের অন্ধকারে। কণিকা এগিয়ে যায় জীবনের স্বর্ণ-উষার দ্বার খুলতে আর এক পারে।

*   *   *

ভরতমুণি সব ত্যাগ ক'রে নিলেন বনবাস-জীবন। সঙ্কল্প করলেন কঠিন তপস্যার। সব কিছু নিঃসার ভেবে ত্যাগ করলেন সর্ব্বস্ব। বুঝলেন ইহ-জীবনে সবই অসার, কেবলই মায়া। মায়া কাটিয়েই তিনি গ্রহণ করলেন সন্ন্যাস-ধর্ম্ম। কিন্তু পরে সামান্য এক বনের পশু হরিণ-শাবকই করল তাঁর ব্রত ভঙ্গ। অসার আর মায়ায় ঘেরা জীবনের প্রেমে বদ্ধ হলেন। জীবনকে বাঁচাতে গিয়ে বুঝলেন এ-জীবনের মূল্য কতখানি? ভালবাসলেন নূতন ক'রে পরিত্যাজ্য জীবনকে আবার। বাঁধা পড়লেন পুনরায় সৃষ্টি-খেলার মায়া-গণ্ডিতে।

ভারি রহস্যময় ডাক্তার কাকুর এ-জীবন। যতই ভাবেন, ততই আশ্চর্য্য লাগে। অভিভূত হন পরম বিস্ময়ে। কি ছিলেন তিনি, আর আজই বা কি হয়েছেন?

দীর্ঘায়ু জীবনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে স্তব্ধ বৃদ্ধ যেন আরও হন নিস্তব্ধ। কোথায় ছিল কণিকা? কেই বা সে? কেমন করেই বা ভগবান বেঁধে দিলেন তাকে কণিকার সঙ্গে?

কণিকা নেই। কতদিন হলো চলে গিয়েছে দেশ ছেড়ে। উন্নতির আলো-পথে তার জীবনের এখন শুভযাত্রা। চিঠি লিখেছে একটা একটা ক'রে অনেকগুলো ইতিমধ্যে। অবনীও প্রণাম জানিয়ে পরিচয় করেছে তাঁর সঙ্গে। বার বার আশ্বাস দিয়ে লিখেছে—আপনি এতটুকু ভাববেন না কাকু। কণিকার কোন অসুবিধা হবে না

জানবেন। কণিও নিজের সমস্ত সুখ সুবিধের কথা লিখেছে— চিন্তা করো না কাকু। সত্যিই সুখে আছি আমি। অবনীবাবু সকল দিক দিয়ে যথেস্ট সুযোগ সুবিধে ক'রে দিয়েছেন। সব সময়ই দেখাশোনা করেন।

চিঠি পড়ে আনন্দই পেয়েছেন কাকু। তবু উদ্বিগ্নের শেষ যে হয় না। বাপ-মা হারা বড় দুঃখী মেয়েটা। কখনো এতদূরে দেশ ছেড়ে থাকেনি। কণিকার যাওয়ার পর থেকে একটি মুহূর্ত্তও যেন তাঁর ভাল লাগছে না এখানে। ছিলেন একলা। ঘর বাঁধ্‌তে গিয়েও ঘর ভেঙে যায় তাঁর। জীবনে কেবল সেবাই ধর্ম্ম জেনে ত্যাগ করেছিলেন সবকিছু। সঙ্কল্প ছিল যতদিন বাঁচবেন মানুষের কাজেই কাটিয়ে দেবেন দিনগুলো।

নিজের বলতে রাখেননিও কিছু। বিরাট সম্পত্তির অনেকটাই দান ক'রে দিয়েছেন আর্ত্তের সেবায়। নিঃস্বার্থে নিজের আয়ও বণ্টন ক'রে দেন দরিদ্র-নারায়ণের সেবায়। নিজের ঘর বাঁধা না হলেও ঘরে ঘরে তাঁর ছিল আদরের ঠাঁই। আপন-জন না থাকলেও জনে জনে বেঁধে রাখে তাঁকে পরম আদরে।

কিন্তু কণিকাই এসে করলো তাঁর ব্রতভঙ্গ। জীবনের সকল বিস্তৃতি তখন তাকে কেন্দ্র করেই রচনা করলো বদ্ধনীড়। কণিকাও তো পর। কিন্তু সেই এখন সবার থেকে তাঁকে টেনে নিয়ে এলো। যেন চরম স্বার্থপরের মত করলো আত্মসাৎ।

উন্মুক্ত আকাশে ওড়া ডানামেলা পাখী বাঁধা পড়লো সোনার শিকলে। মায়া তাকে গ্রাস করলো নিঃশেষে। কণিকা কখন তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসলো জানতেও পারলেন না। যতদিন কাছে ছিল বুঝতে পারেননি কণি তার কতখানি? আজ তার অবর্ত্তমানে পাগল হয়ে উঠেছে মনপ্রাণ।

শূন্য ঘরে একলা বসে মনে পড়ে কণিকার কত কথা। অতটুকু কচি জীবনের কি নিদারুণ নাট্য-পরিণতি। সুন্দর জীবন নতুন

আশার স্বপ্নে হয়ে উঠলো রঙীন। কণি ডক্ট্রেট পেতে গেছে। দীর্ঘ চার বছর থাকবে সেখানে। অবনীও ফিরতে পারবে না। কথা দিয়েছে তারা দু'জনা ফিরবে একসঙ্গে।

আরও মুগ্ধকর সে পরিবেশ। যে কথা ওরা স্পষ্ট ক'রে না বললেও, মেজর বোসের বুঝতে বাকি ছিল না যে ওরা পরস্পরকে ভালবেসেছে। অবনীকে বিয়ের কথা জানালে পরোক্ষ ভাবে কণিকার কথাই বলেছে তাঁকে। তিনিও সাগ্রহে অনুমোদন করেছেন সে প্রস্তাব।

কণিকাও যে অবনীকে ভালবাসে কাকুরও তা বুঝতে বাকি ছিল না। বুঝেছেন কাকু তার প্রাণের কথা। স্বপ্ন যে তিনিও দেখেননি, তা তো নয়। কণিকাকে সুখী না করতে পারলে সব যে ব্যর্থ তাঁর। তিনি যে কথা দিয়েছেন—তার মনের মতই ক'রে গড়ে তুলবেন তাকে। সবকিছু ইচ্ছা পুরোন করবেন তার।

কণিকা সুখী হলেই কাকুর সুখ। বড় দুঃখের জীবন তার। তিনি তো সব জানেন। অবনী কি তাকে নিজের করে নেবে? তার মত স্বামী পেলে কণিকার জীবন ভোরে উঠবে গভীর সুখে। তা'ছাড়া কণিকাও তো তার অযোগ্যা হবে না। তার যা কিছু আছে এখনও, সবই তো কণিকার।

মেজর বোসের মুখে অবনীর কথা শুনে তাই আনন্দে দুলে উঠেছিল কাকুর মনপ্রাণ। উৎসাহের আতিশয্যে বলেছিলেন : তাই নাকি স্যার? সত্যি একথা অবনী নিজেই লিখেছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে নিজেই লিখেছে। বলেছে আপনার মতের উপরই সব নির্ভর করছে।

খুশীতে ভরে ওঠেন কাকু : আরে আমার আবার মতামত কিসের প্রয়োজন? যেখানে আপনি স্বয়ং আছেন, আর কারুর মতামতের প্রয়োজন সেখানে থাকবে বলে মনে করি না। তা'ছাড়া কণিকার ভার আর দায়িত্ব আপনিই তুলে নিয়েছেন। আপনার দয়াতেই তার পড়ার

সুযোগ, অবনীর ঘনিষ্ট সাহচর্য্য লাভ। আপনি না থাকিলে ওর ভাগ্য কি এমন ভাবে খুলতো ?

তুই বৃদ্ধের সে আলাপন বড়ই মধুর। দু'জনারই প্রিয় ওরা দু'জন। দু'জনেই স্বপ্ন দেখেন ওদের মধু-মিলনের। গর্ব্বে দুলে ওঠেন জল্পনায় সে দৃশ্য কল্পনা ক'রে।

মেজর বোস কুণ্ঠিত হন কাকুর কথায় : না, না। একি বলছেন ? কণিকা নিজেই সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। তা' না হলে অবনীই বা নিজে থেকে কেন সহসা রাজী হবে। সবই সেই মঙ্গলময় ভগবানের আশীর্ব্বাদ।

—তা' তো নিশ্চয়। তবু ওদের মিলনে আপনিই মিডিয়াম্। অবনী আপনার অনুমতি বিনা চলে না এক পা। সে আপনার ছেলের মতন। আর কণিও আপনার মেয়ের সামিল। মনে পড়ে সেই বন্যার কথা আপনার ? তখন থেকেই ও আপনার স্নেহধন্যা।

—অবশ্যই মনে পড়ে। সত্যি, অতটুকু বয়সে ওর যে কৃতিত্ব সেদিন দেখেছিলাম, তা' বিস্ময়কর বটে। বুঝলেন্—মর্ণিং শোন দি ডে। অবনীর যোগ্যই হবে সে।

প্রিয় পাত্র-পাত্রীর কথায় যেন সুখের অবধি থাকে না। দু'জনেই প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করেন উভয়ের সৌভাগ্যের জন্য।

এত পরিচিত, তবু অবনীর জীবনের বিশেষ কিছুই শোনেননি কাকু তখন পর্য্যন্ত। শোনবার প্রয়োজনও বোধ করেননি তেমন। যতটুকু জেনেছেন তাই ঢের। আজকাল কণির সঙ্গে সেও নিয়মিত চিঠি দেয় কাকুকে। তারই মতন "কাকু" সম্বোধনে তৃপ্তি করে তাঁর সকল দুশ্চিন্তাকে। কাকুও নিজের ছেলের মতন জানান সহানুভূতি অবনীকে। বার বার অনুরোধ করেন—কণির সবকিছু সে যেন স্নেহের চোক্ষে দেখে। ও ভারী সেন্টিমেন্টাল্। সব ত্রুটি যেন নিজের গুণেই মানিয়ে নেয় অবনী।

কণিকাকেও লেখেন—দেখিস মা, অবনীর মনে যেন কখনো

কোন কারণে অসন্তোষ জাগাস্নি। কোন কাজই যেন ওর অমতে করিসনি। জানবি বিদেশে ওই তোর সব—ওই তোর পরম বন্ধু।

মেজর বোসকেও অনুনয় করেন: অবনীকে আপনি একটু গুছিয়ে লিখে দেবেন, সে যেন কণির কোন আচরণে রুষ্ট না হয়। সব যেন মানিয়ে নেয় নিজের ভেবে।

মেজর বোস আশ্বাস দেন: আরে না, না। আপনি অবনীকে চেনেন্ না। তার মতন মাটির মানুষ ছ'টি নেই। তা'ছাড়া ভুলে যাচ্ছেন কেন—কণিকে ও কি চোখে দেখে? ও যে ওর ভাবী জীবনের পরম সঙ্গিণী।

হাসির ঝলকে ঝল্সে ওঠে ডাক্তার কাকুর দীপ্ত চোখ ছুটো। মাথায় হাত ছুটো ঠেকিয়ে বলে ওঠেন চাপা স্বরে: ভগবান ওদের মঙ্গল করুন। তিনি ওদের মিলনকে করুন আরও দৃঢ়তর।

* * *

নামকরা ব্যারিস্টার-কন্যা লতা মিত্তিরকে কে না চেনে? বিশেষ করে সে আবার ছিল কণিকার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বন্ধুমহলে লতার কাছ থেকেই কণিকার সম্বন্ধে পেতো সব কিছু খবর। সকলেই ওকে জিজ্ঞাসা করতো: হ্যাঁরে, ওদের কিছু খবর পেলি?

যখনই কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতো তখনই শুধু কণিকার নয়, সেই সঙ্গে অবনীকে জড়িয়ে থাকতো তাদের প্রশ্নগুচ্ছ।—সত্যি! ওরা তা'হলে এখন এক জায়গাতেই থাকে, না?

লতা হেসে বলে: তোরা কি পাগল হলি?

—ধ্যাৎ, তুই বড় চাপা। মেজর বোস্ যে বললেন, কণি এখন ওঁর কাছেই থাকে।

মীরার আগ্রহের শেষ নেই।

বোঝায় লতা তাকে: আরে না না। কোন ইয়ংদের শুনেছিস অমন ক'রে বাস করতে? তোরা ভারী নন্‌সেন্স্। আর তোরা ভাবিসই বা কি করে যে ওদের এনগেজমেন্ট্ একেবারে সেটেলড্?

—তা নয় তো কি ? আর এতে মনে করার দোষই বা কোথায় ? মীরা থামতে চায় না।—তুই লুকলে কি হবে ব্যাপারটা সবাই জানে। এবং সকলেই নিশ্চিন্ত যে অবনীবাবু ওকে ছাড়া কাউকে বিয়েই করবেন না।

—তা হলে সবই যখন জানিস, তখন আর জেরা করছিস কেন ? একটু গম্ভীর হয়ে লতা শেষ করতে চায় কণিকার প্রসঙ্গ।

—জেরা নয় লতা। তুই ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোকে সব কথাই ও লিখে জানায়। তাই তুই-ই এখন ওর নির্ভরযোগ্য রিপোর্টার। —মীরার ঠোঁটের কোণটা একটু বেঁকে যায় কথার ভঙ্গীতে।

লতা রাগলেও ওপরে প্রকাশ করে না। ভাবে, সত্যই তাই। লতাকে কণিকা সব কথা খুলে লেখে। বলে তার ওখানকার নিত্য নতুন জীবনের কথা। শোনায় অবনীবাবুর সব কাহিনী পাতার পর পাতা।

চিঠি সে অনেককেই লেখে। মেজর বোস, ডাক্তারকাকু প্রায়ই তাদের চিঠি পায়। সব ঘটনাই আজ দু'বছর ধরে তারা জানাচ্ছে তাঁদের।

তবে লতাকে যে-চিঠি দেয় তার একটা পৃথক মূল্য আছে। অবনীও লতার সঙ্গে পরিচয় ক'রে নিয়েছে চিঠির মাধ্যমে। লতা উত্তর দেয় দু'জনকেই। কখনো এক খামে। কখনো ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানায়।

লতার মুখ থেকেই শুনেছে বন্ধুরা।—কণি থাকে একটা লেডী হোস্টেলে। সেখানে অনেক ভারতীয় থাকে। কাজ ছাড়া অবনীর কাছে ঘেঁষবার সুযোগ খুব কমই তার।

অবনী একজন বড় ডাক্তারই শুধু নয় ; ওঁর সার্কেলও ওখানে সাধারণের অনেক উঁচুতে।

কণিকা তার সঙ্গ পায়। কিন্তু সে সঙ্গ আগের চিঠিপত্রের মধুর অ-দেখা সঙ্গ নয়। ওখানে কাজ ছাড়া তিনি দেখা করবার অবসর পান না এতটুকু।

কণিকার নিজেরও বিস্ময় কম নয়। তার স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুরের

সঙ্গে কতই না তফাৎ এই কাজ-পাগল লোকটার। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয় কণিকার তাঁর নিরলস সাধনায়। গর্ব্ব জাগে নারী মনের সুক্ষ্ম তারে পৌরুষের অমেয় শক্তি দেখে।

লতা তবু থামে কৈ? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত কথাই না জিজ্ঞাসা করে কণিকে। কণিকা কিছু বলে। কিছু চেপে যায় লজ্জায়।

ডাক্তার কাকুর কাছে লতা প্রায়ই যায় আজকাল। কণিই তাকে বার বার অনুরোধ করেছে; অন্ততঃ রোজ যেন লতা একবার কাকুকে গিয়ে দেখে আসে।

কণির কেউ নেই। ডাক্তার কাকুই তার এখন সব। বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে ছেড়ে এসে কণিকার ভাবনার শেষ নেই।

লতা ভরসা দেয়ঃ তুই কিছু ভাবিসনি কণি। আমি রইলুম। তোর মতন আমিও তাঁর একজন যে মেয়ে, একথা ভুলে যাসনি।

নিষ্ফল আশ্বাস নয়। সত্যই লতা ডাক্তার কাকুর দেখাশোনা করে। আজকাল প্রায় তার অবসর সময় কেটে যায় ডাক্তার কাকুর সঙ্গে গল্প করতে করতে।

কণিকা চলে যাবার পর কাকু যেন ভেঙে পড়েছেন। আরও অনেক বেশী বুড়িয়ে গেছেন মনে হয়। হস্‌পিট্যালে একবার যাওয়া ছাড়া সচারচর আর কোথাও বের হন না।

—আর কিছু লিখেছে কণি তোমায়?

গল্পের মাঝখানে হঠাৎ এ-প্রশ্ন প্রায়ই লতা আজকাল শুনতে পায় তাঁর মুখে। 'আর কিছু' যে কি?—বলে শেষ করতে পারে না লতা। তবু কেবলই কাকু ভাবেন, লতা বোধ হয় সব বলছে না।

আগ্রহ থামে না। চিঠিটা সব পড়া শেষ হলে বলেনঃ কৈ? এইটুকু মাত্র? অবনীর কথা তো লেখেনি একদম। তোমায় ও কি তার কথা বলে না কিছু?

লতার হাসি পায় কাকুর বিস্ময় দেখে। কিছুতেই বোঝাতে পারে না তাঁকে—হ্যাঁ, এই সে লিখেছে। আজকাল প্রায়ই তো এরকম

চিঠি লেখে। যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি নীরস। অবনীর কথা কদাচিৎ লেখে। তাও এড়িয়ে যাওয়ার সামিল। সে যে ওর একজন কেউ অন্তরঙ্গ, বোঝা যায় না তা এতটুকু তাতে। অবনীর চিঠিও তাই। কেবল মামুলি ধরণের সংবাদ দেওয়া নেওয়া।

অথচ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত কত কথাই না জানাতো কণিকা। লিখে লিখে যেন শেষ করতে পারতো না।—তোর কথা বলেছি ওঁকে। যা ভেবেছিলাম তা নয় রে। ভারী দুষ্টু। অমন গম্ভীর মানুষের ভেতরেও যে এত বদমায়েসি বুদ্ধি থাকবে কে জানে?

লতার মনে পড়ে কণিকার আগের একটা চিঠির কথা। পড়তে পড়তে সে চিঠি, তারই কান দুটো রাঙা হয়ে গিয়েছিলো।—সেই যে সেই সী-বীচে একদিন? হঠাৎ চোখে হাত দিয়ে বললে অবনী, দেখতো কণি চোখে কি পড়লো?

ব্যস্ত হয়ে কণিকা চোখের ভেতর ভাল ক'রে দেখে। কৈ নাতো? কিছুতো নেই?

—দূর! ওখান থেকে কি দেখতে পাও? কাছে এসে দেখো না। বড্ড কর্‌কর্ করছে যে?

কণিকা সরে আসে এবার অনেক কাছে। একেবারে অবনীর বুকের কাছে। চোখে হাত দিয়ে, মুখখানা আরো কাছে এনে আবার দেখতে চেষ্টা করে। ঠেকে যায় তার চওড়া কপালখানা অবনীর চিবুকে। চোখ দুটো এবার চেয়ে ফেলে সে।

—কৈ কিছুতো দেখতে পাচ্ছি না? আবার বলে ওঠে কণিকা উদ্বিগ্ন হয়ে।

—সত্যি দেখতে পারছো না? এবার দেখতো। এই বলে অবনী হঠাৎ তাকে চেপে ধরে বুকের ওপর। তারপর অস্ফুট স্বরে বলে: তুমি ভারি বোকা। ওকি বালি? ও যে চোখের তারায় তোমার মুখের ছায়া। তাইতো অত জ্বালা।

অভিভূত কণিকা এরপর আর কথা বলতে পারেনি। সকল শক্তি

তার লোপ পেয়ে গিয়েছিলো মুহূর্তে। নিজের মুখখানা অবনীর অলেস্টারে ঢেকে নিথর হয়ে গিয়েছিল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর যখন বাড়ী ফিরল, অনুভব করলো তার রাঙা ঠোঁট দুটোর মতন সমস্ত দেহটাও যেন পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে কী এক অসহ্য আতসে।

লতা এ চিঠি পড়ে খুব বকে দিয়েছিলো কণিকাকে। বলেছিলো—তোর মতন মেয়ে যে এত দুর্ব্বলমনা তা আগে জানলে আত্মরক্ষার কটা মন্ত্র শিখিয়ে দিতুম।

কিন্তু সেই শেষ। আর এমন চিঠি সে পায়নি একখানাও। এর পরের চিঠিগুলোয় কেবল থাকতো তার নিজের পড়ার কথা। অবনীর নামও কোথায় বড় একটা দেখতে পেতো না সে।

তাই ডাক্তার কাকুর ও প্রশ্নে লতা চুপ করে থাকে। ভেবে উঠতে পারে না কি জবাব দেবে তাঁকে। সত্যিই কণিকা আজকাল অবনীর নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করে না।

ডাক্তার কাকু আরও যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন ওদের চিন্তায়। কেবলই ভাবেন, ওই বুঝি অবনীর সঙ্গে ঝগড়া হলো কণিকার। ওই বুঝি অবনী রাগ ক'রে কণিকার সব সম্পর্ক ত্যাগ করলো। সবকিছু শুভ সংবাদ। দিনরাত তবু কেমন যেন দুঃস্বপ্ন দেখছেন তিনি।

লতাকে বলেন ঃ তুই মা ওকে লিখে দে ও যেন অবনীর কথা পত্রপাঠ লিখে জানায়। নিশ্চয় ওদের ভেতর কিছু একটা হয়েছে।

লতা লিখে দেয় কাকুর কথা মত। তিনি নিজেও লেখেন অবনীকে। উত্তর আসে দুজনারই। সবই শুভ খবর। কণিকা লিখেছে লতাকে—ভয়ে লিখি না ওঁর কথা। পাছে তোর লোভ বাড়ে।

পড়তে পড়তে লতা বলে আপন মনে ঃ ফাজিল্ মেয়ের কথা দেখ না। আহা! আমি যেন ওর অবনীকে কেড়ে নেবো। রেখে দে আঁচলে ঢেকে।

হেসে ফেলে নিজের কথায় নিজে।—তবু যা হোক্। ঝগড়া নয়—অনুরাগ ?

ডাক্তার কাকুকে অবনী লেখে—না, না। আপনি ওসব ভাববেন না কিছু। আর একটা বছর। কণিকা বেশ ভালই আছে। দিন দিন থিসিসে প্রগেসৃও করছে ভাল। কে বলেছে—আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে ? আপনার কণি কি সেই মেয়ে মনে করেন ?

কিন্তু লতাকে সে লিখেছে অন্য। বলেছে ঃ ভারি দুষ্টু ! রাতদিন কেবল আমার কাছে আপনার গুণ-গান করে। আর বলে—আপনি নাকি আমার জন্যে খুব চিন্তা করেন। দেশে ফিরলেই ও বলছে—আপনার সঙ্গে আমাকে 'বিশেষ ভাবে' আলাপ করিয়ে দেবে। আমি নাকি তার অন্যান্য সাসপেক্ট্‌দের কাছে নিতান্তই নগণ্য।

—ছিঃ, ছিঃ। লজ্জায় লতা যেন মরে যায়। কি বেহায়াই হয়েছে কণি ? এসব কথা সত্যি বলেছে নাকি ওঁকে ? পত্রপাঠ তিন পাতা কড়া উত্তর চলে যায় লতার।

স্তম্ভিত হয়ে যায় কণিকা লতার চিঠি পড়ে। তাড়াতাড়ি চিঠি লিখে জানায়—সব মিছে কথা ভাই। ও নিজেই ওই সব বাজে কথা তোকে লিখেছে। ছিঃ, ছিঃ। দেখ্‌ছিস মেয়েদের সম্বন্ধে ওর কি ধারণা ? তুই একটা মান-হানির কেস্ করে দিস দেশে ফিরলে। আর আমিও একটা এখনই করে দিচ্ছি এখানে।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে লতা। ডাক্তার কাকুকে বলে ঃ ওদের খুব মিল আছে দু'জনার। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমায় সব লিখেছে। ওরা খুব সুখে আছে পরস্পরে।

শান্তি আসে ডাক্তার কাকুর মনে ঃ তাই হোক মা। ওদের যেন কোন দিন বিচ্ছেদ না আসে জীবনে। কণির বড় আঘাত-খাওয়া বরাত্। জীবনে ও বড় কষ্ট পেয়েছে। কথা বল্‌তে বল্‌তে গলা ধরে আসে। সজল হ'য়ে ওঠে কাকুর চোখদুটোও। উঠে যান সোফা ছেড়ে জানলার কাছে।

সান্ত্বনা দেয় লতা। যাতে মন খারাপ না করেন, বাড়িয়ে বলে কণির অনেক কথাই। তবু লক্ষ্য করে, এদান্তি তিনি কেমন যেন ভেঙে পড়ছেন। কাজ কর্ম্মেও তেমন কোন উৎসাহ নেই। কেবলই বলে কি হবে আর এসব? যার জিনিস সে এলেই সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হই। আমি বড় ক্লান্ত মা। এদের কিছু একটা না হ'লে কিছুতেই যেন শান্তি পাচ্ছি না মনে।

বোঝে লতা। দেখতে পায় কি যেন একটা গোপন ব্যথায় দিন-রাত পিষ্ট হচ্ছে কাকুর মন-প্রাণ। বলতে বলতে কি যেন একটা ভাবনায় থেমে যায় অকস্মাৎ। চোখ বুজিয়ে কি যেন ভাবেন নিঃশব্দে। তারপর দম্‌কা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে চলে যান অন্য ঘরে।

কতদিন এমন হয়েছে। লতা ভাবে একথা লিখে জানাবে কণিকাকে। হয়তো তার জন্যই কাকুর মন এত ভেঙে পড়েছে। লতা দেখে কাকু আর যখন তখন মেজর বোসের বাড়ী যান না। বল্‌লেই বলেন: আজ থাক মা। তিনি কাজের লোক। একটু অবসর পান না। তাছাড়া, আমার শরীরটাও তেমন সুবিধের নয়।

এখনও লতা জানে না, কণি ডাক্তার কাকুর কেউ নয়। তিনি নিজেও কারুর কাছে বলেননি কিছু এ সম্বন্ধে। সবাই জানে কণিই তাঁর একমাত্র সত্ত্বাধিকারী। কাকুই কণির সব। শুধু খাওয়া-পরা আর রক্ষণাবেক্ষণ নয়। কণিকার সর্ব্ব অবস্থায় উৎসাহ দিয়ে ভরসা দিয়ে এই কাকুই যেন বাঁচিয়ে রেখেছেন তাকে। বলেছেন কতবার: আঘাত পেয়েছিস বলেই যে ভেঙে পড়তে হবে তার অর্থ কি? জীবন তো স্থাবর নয়,—জঙ্গম। যতক্ষণ পারা যায় এগিয়ে চলাই তো এর ধর্ম্ম।

এ কথায় কণিকা বলে: কিন্তু পরিবেশকে এড়াবেন কি করে? তার নির্ম্মমতা কি এ-চলায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না।

উত্তরে কাকু বলেন: নুড়ির স্তূপ পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলে নির্ঝরিণী কি থমকে দাঁড়ায়? বহে চলাই তার ধর্ম্ম। নুড়ি ঠেলে তাকে ডিঙিয়ে তার ধারা ছুটে চলে। নুড়ির বাধা তখন আর

বাধা হ'য়ে থাকে না। পায়ে ঝুমুর হয়ে বাজে। পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করাই তো জীবনের সাধনা। না হোক সফল। তবু যুদ্ধ ক'রে এগিয়ে যেতে হবে। থামলেই মৃত্যু। ক্লান্ত হয়ে নিরাশ হলে বিপদ যে আরও আসে ঘনীভূত হয়ে।

—তা হলে সংগ্রামই সব ?

—নিশ্চয়ই। আমৃত্যু সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই জীবনের মূল্য যাচাই হয়। মৃত্যুতো পরাজয়। বেঁচে থাকাই জয়। ঘরে-বাইরে সংগ্রাম ক'রে নিজেকে লক্ষ্য পথে টেনে নিয়ে যাওয়াইতো মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ সাধনা।

—জীবনভোর যদি সংগ্রামই করবে মানুষ, তবে বেঁচে থাকার অর্থ ? তার আনন্দ ?

—সৃষ্টি-খেলার যদি কিছু মূল্য থাকে, থাকে কোন আনন্দ—তা তো এই জীবনের বেঁচে থাকার যুদ্ধ-খেলাতেই আছে। তা না হলে সৃষ্টি-কর্ত্তার খেলাও যে ব্যর্থ।

কণিও বাঁচতে চেয়েছে তাই। সংগ্রামী হয়েই টিকে আছে। এগিয়ে চলেছে তার লক্ষ্যর ধ্রুব-পথে। সে আঘাত পেয়েছে। বার বার চরম আঘাতে জর্জ্জরিত হয়েছে তার কোমল মন প্রাণ। যাতনায় ছটফট করেছে—কিন্তু ভেঙে পড়েনি আর্ত্তরবে। পুড়েছে পরিবেশের অসহ জ্বালায়। তবু বুক চিরে দেখায়নি কাউকে সে-আগুনের লক্‌লকে শিখা। নিঃশব্দে বীরের মতই তালে তালে এগিয়ে চলেছে বিপদ-বাধার সঙ্গে পা ফেলে। থমকে দাঁড়ায়নি মাঝপথে। তাই মরে যায়নি। আজও বেঁচে আছে। হয়তো থাকবেও বেঁচে।

ডাক্তার কাকুর গর্ব্ব হয়। তিনি তো এই শিক্ষাই দিয়েছেন তাকে। তিনি নিজেও তো জীবনকে এমনি ভাবেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন বার-বার। লতা যখন বলে—সত্যিই কণি 'লাকি' কাকু। তা না হলে, মেজর বোস আর অবনীর মতন লোকের সাহচর্য্য পায় অত সহজে ?—ডাক্তার কাকু হেসেছিলেন সে-কথায়। বলেছিলেন : "লাক্" কি মা অত সহজে ধরা দেয় ? ওকে ধরতে হয়। বড় দুর্দ্দান্ত ও। তাই

ধরেও শান্তি মেলে কৈ ? আচ্ছা মা, কণিকে তোদের সব কেমন মনে হয় বল্‌তো ? ওকি সত্যিই অবনীর যোগ্য ?

রহস্য জাগে কাকুর এমন প্রশ্নে। লতা বলে ঃ ঠিক বুঝলাম না কাকু আপনি কি বলতে চাইছেন ? আমার তো মনে হল, অবনীবাবুও যথেষ্ট সৌভাগ্যবান ওকে পেয়ে। ওর মতন মেয়ে কটা আছে বলুন তো ? আমরা ওর জন্য গর্ব্ব অনুভব করি।

—কিন্তু মেয়েরা শুধু লেখাপড়ার যোগ্য হলে কি সব যোগ্যতা নিরুপণ করা যায় ? আসল যোগ্যতার মাপতো তাদের সহনশীলতায় ; তাদের আত্মত্যাগে।

—তা হয়তো ঠিক। কিন্তু ওটাই যে সব—এ আমি মানি না কাকু। মেয়েদের সব কিছুই যে পুরুষ—তথা স্বামীদের সত্তার মূল্যে মাপা হবে তাই বা কেন ? মেয়েদের সত্তার কি কোন স্বতন্ত্র মূল্য নেই ?

—হয়তো আছে। আর তার মূল্যও যে অনস্বীকার্য্য, তা নয়। তবে কি জান মা, সে সৌভাগ্যের মাপকাঠি যে ঐ পুরুষরাই। তাদের মতামতের দাঁড়িপাল্লাতেই যে সেই মাপের মূল্য ধার্য্য হয়। নিরপেক্ষ মাপকাটি আর তুলাদণ্ডের হদিস কোথায় ?

লতা অবাক হয় কাকুর এ যুক্তিতে। এ যে পুরুষ হয়ে পুরুষদেরই সমালোচনা করছেন তিনি।

—এই ধর না তুমি। সাবালিকা, উপার্জ্জনক্ষম। তোমার নিজস্ব মতামত আছে একটা। কিন্তু সমাজে তোমার কর্ত্তব্যবোধ, স্নেহ, ভালবাসা সব যাচাই হবে তোমার স্বামী কতটা এর মূল্য দিয়েছেন, তার ওপর ! তিনি যদি সন্তুষ্ট হন, যদি মর্য্যাদা দেন এই সবের—সমাজে তোমার সত্তা নিরূপিত হবে তাহলে শ্রদ্ধায়। সাহস ক'রে কেউ যাচাই করতে যাবে না সেগুলো যথার্থ কতটা কার্য্যকরী, বা আদৌ তার দাম আছে কি না।

—কিন্তু যুগ তো পাল্টে যাচ্ছে।—লতার স্ব-প্রশ্ন দৃষ্টি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

—তা পাল্টাচ্ছে। কিন্তু মেয়েদের আসনের ভিত কাঁচা-মাটির

ঢেলা যে। কেবলই টোল্ খাচ্ছে। শুধু কি তাই? এতে সমাজেরও সুবিধে অনেক। যখন যেমন ইচ্ছে সহজেই গড়ছে, ভাঙ্ছে।

—কিন্তু পুড়তে পুড়তে একদিন নরম মাটি শক্ত পোড়া-মাটিও তো হতে পারে? আর হচ্ছেও যে, তা কি বুঝতে পারছেন না?

কাকু নীরব থাকেন না। বলেন: অস্বীকার করি না মা। তবে এমন ভাবে তিল্ তিল্ হয়ে পোড়াও যে অসহ্য। এর আতস্ যে ওদের মোটা চামড়ায় একটুও জ্বালা ধরায় না।

লতা গম্ভীর হয়ে যায়। ডাক্তার কাকুর মধ্যে সে এক নূতন ভাবাবেশ লক্ষ্য করে। আর্ত্তস্বরে জিজ্ঞাসা করে: তবে আপনি কি মনে করেন এ ব্যর্থ হয়ে যাবে? শুধু ছাইয়ে পরিণত হয়ে মেয়েরা সমাজের জঞ্জাল স্তূপে পড়বে? তাদের মূল্য কি যথাযথ ভাবে কোন দিন স্বীকৃতি লাভ করবে না পুরুষদের কাছে?

উষ্মায় কেঁপে ওঠে লতার গলার আওয়াজ। ডাক্তার কাকু চোখ বুজে শোনেন সব। নিঃশব্দে হয়ত অনুভব করবার চেষ্টা করেন নারী হৃদয়ের আদিম কান্নার সেই অবুঝ্ অর্থ টা।

কিছুক্ষণ থেমে লতা বলে: আমি একথা স্বীকার করি না কাকু। আমার বিশ্বাস আছে। দেখবেন আমরা আমাদের ন্যায্য স্থান আর অধিকার কায়েম করে নেবই একদিন। আর ধীরে ধীরে নিচ্ছিও যে না, তাই বা ভাবছেন কেন?

চোখ খোলেন কাকু। তাকিয়ে থাকেন লতার শান্ত অথচ দৃঢ় মুখখানার দিকে। যেন তার মধ্যে অসহায়া নারীর এক নূতন সংস্করণকে নূতন রূপে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করেন।

লতা কাকুর দিকে তাকিয়ে বলে: অপ্রাসঙ্গিক হলেও, দেখুন না আমাদের সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে। মেয়েদের পরিবর্ত্তনের ধারা সেখানে স্পষ্টই রূপ পেয়েছে লেখকদের রচনায়। সাহিত্যে—জীবনের ও সমাজের ছবি রসে রূপে আঁকা থাকে। সুতরাং সাহিত্যের যুক্তি অবান্তর নয়।

লতা থামে না। বলে চলে একটানা: বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আর আজকের দিনের অতি আধুনিক সাহিত্যিকেরও লেখায় আঁকা আছে সে সত্য-তথ্য। বঙ্কিম তাঁর রোহিণীর মধ্যে নারী মনের সহজাত প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যে আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু শেষে তথাকথিত সামাজিক নীতি ও ধর্ম্মের মর্যাদার মুখ চেয়ে তাকে সমাজে স্থান দিতে সাহসী হলেন না। বাঁচিয়ে রাখতেও পারলেন না। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গোবিন্দলালের গুলিতে সে বেচারা প্রাণ দিল।

তারপর রবীন্দ্রনাথের সময় কিছুটা যুক্তির বলে স্বীকৃতি লাভ করল সমাজে মেয়েরা। তা' মাত্র খানিকটাই। বিনোদিনী, বাঁশরী সরকার তবু সম্মানিত হলো না সমাজে।

তারপর শরৎবাবু এলেন তুল্য মূল্যের দণ্ড হাতে। অনু-শাসনের গণ্ডি ভেঙে তার নায়িকারা এগিয়ে এলো প্রকাশ্য রাজপথে জীবনের দাবী নিয়ে। সামনা সামনি দাঁড়িয়ে সমাজ রক্ষকদের নানা রংএর এক একটা মুখোশ খুলতে থাকলো একটার পর একটা। আগুন জ্বালিয়ে অগ্নিপরীক্ষা দিতে থাকে মরা রোহিণীরা হাসতে হাসতে। স্তম্ভিত সমাজ পুরুষ শাসিত বিধি-নিষেধের প্রতিক্রিয়ার নগ্ন রূপটা দেখতে পায়। বুঝতে পারে অন্নদা, রাজলক্ষ্মী—অভয়া—কমল কত মূল্যবান রত্ন সব। কত খাঁটি সোনা। কিন্তু হায়! এত কাণ্ডের পরও শরৎবাবু তাদের সমাজে স্থান ক'রে দিতে পারলেন না। ঘরের লোক জেনেও—আদর ক'রে ঘরে তুলতে পারলেন না।

প্রবল উচ্ছ্বাসে চঞ্চল হয়ে উঠলো লতা। অবাক হলেন ডাক্তার কাকু।

—তারপর যুগ আরো পালটালো কাকু। প্রগতিশীল সমাজের তালে তালে মানুষের মনের বদ্ধ সংস্কারও খুলে গেল অনেকখানি। তাই আজকের দিনের লেখকরা সরাসরি তাদের দাবী দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবার সুযোগ পেলো সমাজে। সমাজকেও ক্রমে মানতে হলো

তাদের দাবী। রোহিণীরা আজ অন্ততঃ বুঝতে পারছে তাদেরও সমাজে একটা স্থান আছে। তাদেরও একটা পৃথক সত্ত্বা আছে। পুরুষের গড়া সমাজে নিছক খেল্‌না তারা নয়। মাটি আজ সত্যই কাকু, পুড়ে' পুড়ে' অনেকটা শক্ত হয়ে উঠেছে।

থামলো লতা এবার। একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে হাঁফিয়ে উঠেছিল সে।

কাকু ভাবতে লাগলেন লতার কথাগুলো। লতা ডাক্তার মানুষ। তবু সাহিত্যে কেমন তার সুন্দর দখল। নারীর বেদনাময় জীবনধারা সমাজবিবর্ত্তনে কেমন পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে, সব যেন তার ছক্ কাটা। বিস্মিত হন। এতও ভাবে এ মেয়েটা ?

মনে পড়ে কাকুর কণিকার জীবনের কথা। সেও কি পুড়ে' পুড়ে' শক্ত মাটিতে পরিণত হয় নি ? সেও কি পারবে না স্বাতন্ত্র সত্তাকে বজায় রেখে সমাজে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে ? তার জীবনে অঘটন যা ঘটে গেছে—তা তো তার স্বকৃত কার্য্যের প্রতিক্রিয়া নয়। তার জন্য সমাজের অভিশপ্ত বিধি আর অভিভাবকরাই দায়ী। সে তো পুতুল মাত্র। যেমন জোর ক'রে খেলিয়েছে—তেমনই খেলেছে।

লতা শুধু পড়েছে। নাটক নভেলের বিচিত্র কাহিনীতে চমকে উঠেছে। কিন্তু জীবনযুদ্ধের প্রতিটি পর্ব্বে এই যে 'পোড়া' কত অসহনীয় —কাকু তা দেখেছেন নিজের চোখে কণিকার জীবনে তিল্ তিল্ ক'রে।

তবু আশার স্বপ্ন দেখেন কাকু। লতার কথায় বল পান মনে। বলেন : তাহলে তুমি বলছো কণির মত মেয়ের মূল্য দেবে সমাজ একদিন ?

হঠাৎ দীর্ঘ নীরবতার মাঝে কাকুর এ প্রশ্নে সচকিত হয়ে ওঠে লতা। একথা কেন বলছেন কাকু ? কণিকার সম্বন্ধে হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন তাঁর মনে ?

জিজ্ঞাসা করেঃ কিন্তু কণিকার প্রসঙ্গে ওকথা বলছেন কেন কাকু? আমি যাদের কথা বললাম, তারা তো সবাই এক একটা বিশেষ ঘটনায় জড়িত। যাকে আমাদের সমাজ বলে নীতির দিক থেকে 'গর্হিত'। আর যার ওপর জোর দিয়েই তাদের আসামী ক'রে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে।

—না, না মা। আমি কণির সম্বন্ধে কিছু বলছি না।—সঙ্কুচিত কাকুর জড়িয়ে যায় কথাগুলো।—ও একটা, মানে, উদাহরণ হিসাবে বলছিলাম আমি। কথা ঘুরিয়ে নেন কাকু।—আচ্ছা মা, মেয়েদের যে আরও একটা সমস্যা আছে সেটার বিষয়ে তোমাদের বক্তব্য কি?

লতা বুঝতে পারে না কাকুর কথা। নরম সুরে বলেঃ একটু খুলে বলুন কাকু।

কাকু বলেন ঃ আমি বলছি মেয়েদের মাতৃত্ব-বোধ আর তার কল্যাণ পরিবেশটার কথা। যেখানে সে-প্রশ্ন জড়িয়ে আছে—সেখানে সমাজ কি করতে পারে মা? সে তো একটা বড় কঠিন বন্ধন তোমাদের জীবনে।

হেসে ফেলে লতা। বলে ঃ তা কেন কাকু? আর তাকে আপনি কঠিন বন্ধনই বা বলছেন কেন? মাতৃত্বের দোহাই দিলেই যে মেয়েদের জীবন একটা বিশেষ গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে স্বাতন্ত্র্যচ্যুত হবে—এই বা ভাবছেন কেন?

লতা আবার হাসে সরল ভাবে। ডাক্তার কাকুর কাছে যে-প্রশ্নটা এত গূঢ়, তার কাছে যেন তেমন কিছুই গুরুত্ব নেই এর। তাই সহজ ভাবেই বলে ঃ আমার তো মনে হয় কাকু, আপনাদের হাতে-গড়া সমাজ এই ব্রহ্মাস্ত্রটি দিয়েই আমাদের নারী-জীবনটাকে সবচাইতে বেশী পঙ্গু ক'রে রেখেছে। অনন্তকাল ধরে এই বিষয়টাকে কেন্দ্র ক'রে একটা অলঙ্ঘনীয় নীতি ক'রে ঘিরে রেখেছেন আমাদের অটুট ভাবে। তাই না?

—ঠিক বুঝতে পারছি না মা। এতবড় একটা মঙ্গলময় বিষয়কে·······।

কাকুর অসমাপ্ত কথার মাঝে লতা আবার হেসে ওঠে আর এক ঝলক। বলে ঃ তাইতো বলছি কাকু, অমন সুন্দর বিশেষণ যোগ করেই তো ঐ বিষয়টাকে অত বড় ক'রে তুলেছেন। আর তাই দিয়েই নারী জীবনের প্রতিটি ইন্‌স্টিংক্টকে মরফিয়া ইনজেক্‌সনে অবস ক'রে রেখেছেন আপনারা। পঙ্গু ক'রে ফেলেছেন। আপনি তো ডাক্তার। আপনিতো বোঝেন এটা পিওরলি নারীদেহের একটা ন্যাচারাল রি-এক্‌সান। দুটো পৃথক সেকস্‌ এর পরস্পর কনট্যাকটের একটা অবশম্ভাবী ন্যাচারাল রেসাল্ট।

—কিন্তু এটাও তো মা অপরিহার্য্য ফল। আর সেই হেতুই তার রি-একসান্‌টা কি রিজনেবল্‌ নয় ?

—না কাকু। রিজনবল্‌ হলেও আপনার পুরুষ-শাসিত সমাজে তাকে বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিতে বিচার ক'রে দেখা হয় না।

গম্ভীর হয়ে যায় লতা। সমস্ত নারী জাতির প্রতিনিধি হয়ে সে যেন চ্যালেঞ্জ জানায় দৃপ্ত কণ্ঠে আজ। বলে ঃ আর তারই ফলে ঐ মাতৃত্ব যেন একটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় নারী জীবনে। ওটাকেই সবকিছু ভেবে নিয়ে তাদের মূল্য যাচাই হয়। নিছক একটা একসিডেন্ট্‌ মনে না ক'রে, তার ভিত্তিতেই হিসাব করা হয় মেয়েদের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-শান্তির মাপকাঠি। আরও রহস্য কি জানেন? যাদের জীবনে ঐ একসিডেন্ট্‌টা নাও ঘটে, অনেক সময় বিচারকদের মায়া-জালে তাদেরও কয়েকজনাকে ছলে বলে আট্‌কে পড়তে হয়।

—কিন্তু……, বিস্ময়ে কাকু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন।

লতা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে ঃ এতে কোন 'কিন্তু' নেই কাকু। জীবনে বিয়ে একটা মেয়েদের ঘটনা মাত্র। কিন্তু সেটাই সব, এবং শেষ—এর অর্থ কি ? যদি ঘটনাচক্রে সেই বিয়েতে ঘটে কোন অঘটন, তাহলেই কি তার সমস্ত জীবন—তার স্বপ্ন, সাধনা সবই যাবে ব্যর্থ হয়ে ?

সমস্ত অন্তর ভরে যায় লতার এক অব্যক্ত বেদনায়। সত্যি,

ভগবান কি খেয়ালেই না গড়েছিলেন তাদের। এই পৃথিবীতে কতই না অসহায় তারা?

থামতে পারে না লতা। বলে ঃ আশ্চর্য্য! প্রতিনিয়ত শত সহস্র আপদ বিপদ মানুষকে সইতে হচ্ছে নির্বিববাদে। অসহ্য হয়ে উঠলেও, আবার সংগ্রাম ক'রে উঠে দাঁড়ায়। জীবনে আবার আসে হাসি-আনন্দ-আশা-ভরসা। কিন্তু এই বিয়ের সামান্য ঘটনাকে আমরা সেই তুলনায় কতই না একটা ভীষণ অলঙ্ঘ্য ব্যাপার ক'রে দেখি? আর এত সাধনার জীবনটা নিশ্চিৎ ধ্বংস হ'য়ে গেল, এই ভেবে মরার আগেই মরে যাই শতবার। কি প্রহসন!

—তা হলে তুমি কি এই অগ্নিসাক্ষী রেখে পবিত্র বিবাহটাকে একটা এক্সিডেন্ট্ বলেই মনে কর লতা? এর সামাজিক মূল্য কি কিছু নেই? আমি কিন্তু এটা সংশয় মুক্ত হয়ে মেনে নিতে পারছি না মা।

—ওটা আপনার সংস্কারবদ্ধ মনেরই দুর্ব্বলতা।

—ঠিক তা নয় মা। আমার মতে তোমার ও যুক্তিটা নিছকই একটা যুক্তিমাত্র। বড্ড সাধারণ। এতে বিবাহের মত একটা সামাজিক মঙ্গলচুক্তি—যার ওপর ভরসা করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সুষ্ঠ সমাজ-ব্যবস্থা, তা যে অত্যন্ত হালকা হয়ে যায়। ভুলে যাচ্ছ কেন— এই বিবাহই আমাদের ভবিষ্যৎ পরিবার-ব্যবস্থাকে শোভন ক'রে তোলে।

লতা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলে ঃ আমি তো বলেছি কাকু আজকের বিরাট কর্ম্মবহুল জীবনযাত্রায় ওটা একটা নিছক এক্সিডেন্টই। আর তার যা মূল্য—তা ঐ হিসাবেই; ওর বেশী নয়। ভুলে যাচ্ছেন কেন যুগ পালটে গেছে। এখন বিবাহটা নিছক ঐ অগ্নি আর পুঁথির বিধানে চলে না। তখনকার দিনে ব্যক্তিসত্তার চেয়ে বড় ছিল সমাজসত্তা। কিন্তু আজকের দিনে ব্যক্তিসত্তাই প্রধান। ব্যক্তি-স্বাধীনতাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয়।

—তা হলে শেষ পর্য্যন্ত এতবড় একটা ন্যায্য চুক্তিকে তুমি অশোভন বলতেই চাইছো?

কাকুর সপ্রশ্ন দৃষ্টি লতাকে অভিভূত করে দেয় কিছুক্ষণের জন্যে। বুঝতে পারে তাঁর প্রশ্নে কিসের যেন একটা জ্বালা। একটু নরম সুরে বলেঃ না কাকু, আমি তো একে অশোভন বলিনি। আমি বলছি আজকের দিনে বিবাহে চাই স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের প্রত্যক্ষ সম্মতি। আর জীবনে তাকে শোভন ক'রে তুল্‌তে প্রয়োজন তাদের দুজনের সজাগ-প্রস্তুতি। যেখানে তা না ঘটে সেখানে অশোভন ঘটনা ঘটতে বাধ্য। তখন যদি তাকে আপনারা বলেন—মেয়েদের ভাগ্য অথবা গত জীবনের অভিশাপ—তা বিস্ময়করই বটে।

একটা মলিন হাসি ছড়িয়ে পড়ে লতার গম্ভীর মুখটার ওপর। ডাক্তার কাকুও এরপর নীরব হন। ছায়ার মত কণিকার কথা ভেসে ওঠে তাঁর চোখের তারায়। লতার যুক্তি দিয়ে আজ তাকে দেখতে চাইছেন যেন আর একবার নূতন ক'রে।

তবে কি কণিকার জীবনও অভিশপ্ত? তাকেও কি বলবেন তিনি ভাগ্য? বিয়েতে তার মতের কোন প্রয়োজন হয়নি। অমলবাবুরও দোষ ছিল না। তিনি সব জানাতেই বলেছিলেন তাকে। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন আর কণিকার মা-মামা জানায়নি তাকে কিছু। সকলেই দেখেছে,—বংশ, সম্পত্তি। ভবিষ্যতের আঁখের।

কাকু ভাবেন—মেয়েদের স্বতন্ত্র্য কোন চাহিদার বিচার করে না কেউ। যাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে হবে জীবনে, বিবাহের কিছু আগেও তার সম্বন্ধে জানতে পারে না পরস্পরে। আরো বিবাহের পর যত অশোভন, যত অসহ্য হোক নিঃশব্দে হজম করতে হয় সমস্ত অন্যায় অবিচারকে। আগুন জেনেও ঠেলে দেয় তার মধ্যে ছলে বলে। আর পুড়ে পুড়ে ছাই হতে থাক্‌লে বলে—সবই ওর ভাগ্য। না হলে এমনি হয়?

সত্য! লতা সত্যই বলেছে প্রহসন একে! কণিকা সহ্য করতে পারেনি। বিনা প্রতিবাদে পারেনি নির্দয় অবিচারকে মেনে নিতে। তাই হয়ত ওর বাড়াবাড়িটা কিছুতেই শোভন বলে ভাবতে পারছেন না

তিনি। বুঝেছেন অন্যায় নয়—তবু সংস্কারে-পিষ্ট মন কিছুতেই হচ্ছে না সংশয় শূন্য।

একসময় বলেন : আচ্ছা লতা, মেয়েদের স্বামী-ত্যাগ এবং পুনর্বিবাহকে তুমি কি সার্পোট করো?

—না করার যুক্তি পাইনা কাকু। লতা বেশ সহজেই উত্তর দেয়।—শুধু আমি নই, আজকের দিনে এ সম্মতির যে প্রয়োজন আছে, অধিকাংশই তা মনে করে। তাছাড়া বিষয়টা পুরুষদেরই বা একা অধিকারভুক্ত থাকবে কেন? বিয়ে শুধু পুরুষরাই করে না। বরং মেয়েদেরই এতে দায়িত্ব অনেক বেশী। এবং এতে কোন অঘটন ঘটলে তাদেরই ভুগতে হয় বেশী। সুতরাং এ ব্যাপারে তাদেরও অধিকার না থাকার কারণ কি?

—কিন্তু পুরুষদের ব্যাপার স্বতন্ত্র্য। মেয়েদের কি এতে মঙ্গল?

কাকুর এ প্রশ্নে লতা একটু দ্বিধান্বিত হয়। হেসে বলে : এইখানেই আপনাদের ফাঁদের জালটা ঘন করে বোনা কাকু। যা কিছু স্বাতন্ত্র্য—সবই পুরুষদের। আর মেয়েরা কেবল তাদের অনু-গামিনী?

কথা থামিয়ে আবার লতা হেসে ওঠে হো হো ক'রে। বিদ্রুপের সে হাসিতে কাকুর মধ্যে নড়ে চড়ে ওঠে হয়তো সহস্র পুরুষের কঠিন আত্মাটা আজ। বোঝেন কাকু। অনুভব করেন পুরুষের গড়া এ সমাজের দৈন্য কোথায়? হয়তো ঐ হাসির ঝলকে শুনতেও পান অনন্ত কালের পিষ্ট নারী-জীবনের করুণ আর্ত্তনাদটা।

—আর কি জানেন,—পুরনো কথার জের টেনে লতা বলে—ঐ মঙ্গল বিধান আওড়েই তাদের ক'রে রেখেছেন পঙ্গু। কিন্তু আজ যুগের দাবীতে দেখুন সে অধিকার, আইন হয়ে বিধিবদ্ধ হলো সরকারী নথিপত্রে। আর এতে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—ঐ ব্যাপারটা অবশ্য কিছু অমঙ্গলের নয়? তাহলে সমর্থনের চাইতে প্রতিবাদ উঠতো। বেশী।

কাকু বলেন ঃ জীবনটায় শুধু আইন কানুন প্রয়োগ করলেই শান্তি আসবে—এই তোমার বিশ্বাস ? যাই বলো, এ বিষয়ে তৈরী করা আইন-কানুন নিছক একটা চুক্তিই মাত্র।

—তবুও এ যে একটা মুক্তির আশ্বাস, এটা তো অস্বীকার করতে পারবেন না।

কাকুর কথায় এবার তিক্ত হয়ে ওঠে লতার মন। বৃদ্ধের সংস্কার-প্রীতি সত্যিই বিস্ময়কর। একটু শ্লেষ টেনে তাই আবার বলে ঃ তাছাড়া এতে মেয়েদের নূতন ক'রে বাঁচবার একটা পথও এতদিন পেয়েছে তারা। যতই অসহ্য হোক, দুর্লঙ্ঘ্য বিবাহ-গণ্ডিতে একবার বাধা পড়লেই যে আর মুক্তি নেই—এ মিথ্যে ভয় থেকে নিশ্চয় নিস্তার পেয়েছে আজ তারা। শক্তি থাকলে অনায়াসেই আবার নূতন জীবন গড়ে তুলতে পারে। কোন অন্যায়—অমঙ্গল নেই এতে। আজকের দিনে সব মানুষই হচ্ছে মোটের ওপর একটা—"হিউম্যানবিয়িং।"

—তবু ভুল করছো মা, ইব্‌সনের ও থিওরীর চেয়ে আমাদের ভারতবর্ষের আদর্শ অনেক বড়।

—আপনিও ভুল করছেন কাকু। 'নোরা' একটা বিশেষ দেশের বিশেষ মেয়ে নয়। আজকের জগতের সমস্ত মেয়ে-জাতের সে একটা মূর্ত্ত-প্রতিনিধি। মানবাত্মার নিরঙ্কুশ ন্যায্য দাবী নিয়েই তার কণ্ঠ বেজে উঠেছে বজ্র নির্ঘোষে। পৃথিবী কি পারবে তাকে অন্যায়, অসঙ্গত বলে দূরে ঠেলে রাখতে ?

বিস্মিত কাকু স্তব্ধ হয়ে যান এরপর। সহসা আর কোন কথা যোগায় না তাঁর মুখে। লতাও আর কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে শুধু তাকিয়ে থাকে দূরের ঐ অসীম আকাশটার দিকে। কি এক অতল ভাবনায় তার মন যেন হারিয়ে যায় সুদূর নীলিমায়। সব শূন্য। তবু তারই মধ্যে অনন্ত-কালের সমস্যার একটা খেই খুঁজতে হারিয়ে ফেলে সব নিশানা। কথায় কথায় কত কথা আর আলোচনাই না আজ বেরিয়ে এলো তার অনভিজ্ঞ মন থেকে। সাজিয়ে গুছিয়ে ভেবে-চিন্তে বলেনি

সে কিছু। কি এক তাগিদই তাকে আজ ক'রে তুলেছে অনুপ্রাণিত। তবু সংশয়। ডাক্তার কাকু এ বিষয়ে কেন এত উদগ্রীব? জীবনে এ সমস্তার সমাধান ক'রে তাঁর কি হবে? তিনিতো আ-জীবন অবিবাহিত। তাছাড়া, মেয়েদের এত সমস্যা নিয়ে তাঁর উৎসুক্য কেন? তবে কি কণির কিছু……

অসমাপ্ত চিন্তা বাধা পড়ে মাঝপথে। মুখ ফিরিয়ে দেখে কাকু তখনও তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। কে জানে, কোন্ দুরূহ চিন্তায় আজ তিনি মগ্নচেতন?

সত্যই ডাক্তার কাকু হারিয়ে গেছেন। এক গহন অরণ্যে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন হাতড়ে হাতড়ে। হয়তো পাচ্ছেন কিছু, তবু মন তার সংশয়শূন্য কোথায়? কোনটা সত্য আর সহজ পথ—কিছুতেই পারছেন না তার নিশানা ঠিক করতে।

লতা যেন লতা নয়। শত সহস্র কণিকার নিপীড়িত আত্মা বুক চিরে যেন কথা বলে গেল এতক্ষণ ধরে। কোনটা কি ব্যর্থ হাহুতাশ্বাস্? না, যুক্তিহীন উচ্ছাস? এ যে সমগ্র নারীজাতের অতি ন্যায্য তর্কাতীত দাবী। এ যে সেই কণিরই অব্যক্ত বেদনার এক স্বতঃস্ফূর্তি।

কণিও যে বাঁচতে চায়। জীবনভোর তার এ সংগ্রামের মূলেও তো সেই একই সুগভীর আকুতি। আশা-আশঙ্কা, সুখ-শান্তি তারও যে চাই। সবাই অন্যায় ভাবে তাকে দমিয়ে রেখে পঙ্গু ক'রে দিতে চাইলে কি হবে? সেও যে এই পৃথিবীর মানুষ একজন। পারবে কেন তার নায্য অধিকার আর দাবীকে তুচ্ছ করতে? মূল্যহীন স্বার্থপর যুক্তি-নীতিকে কেনই বা ভয় করবে সে? কণি আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। আবার নূতন ক'রে জীবনকে ঢেলে সাজিয়ে তুলছে তিল তিল ক'রে। বিবাহের পূত-গণ্ডিতে বদ্ধ হয়ে চিৎকার করে বুক ফাটাচ্ছে না অব্যক্ত বেদনায়।

চমকে উঠেছিল কণিকার মা। উষ্মায় ফেটে পড়েছিল কণিকার

মামা-মামী, আত্মীয়-স্বজনরা। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন ডাক্তার-কাকুও প্রথম তার সব কাহিনী শুনে।

লুকোয়নি কণিকা। ভনিতা ক'রে ঢাকতে চায়নি। সহজে শুধু ভুলতে চেয়েছে সে বেদনাময় পরিস্থিতি। চির অশান্তিভরা সে স্মৃতিকে কেবল মুছে ফেলতেই চেয়েছে। নিছক একটা বাধা ভেবে দু'পায়ে মাড়িয়ে দলে যেতে চেয়েছে নিঃশেষে।

কি হলো—কি হয়ে গেলো, আর তার ফলে কিই বা হবে ?—বৃথা এ চিন্তায় কাল কাটায় মূর্খরাই হয়তো। যা হচ্ছে—যা আসৃছে, তাকে কেমন করে গ্রহণ করবে, কি ভাবে তখন হাঁটবে আবার; তা ভেবে মনকে শক্ত করে গড়ে তোলে ক'জনা ? কিন্তু যারা তা করে' মনে হয় তারাই নূতন ক'রে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। নূতন ক'রে জীবনও তাই তাদের প্রাণে প্রাণের বাঁশী বাজায়। তখন চলার পথ বদলায়। পট্ পালটায়। তৈরী হয় নূতন প্লট্। কণিকাও আজ সেই নূতন প্লটের নবীন্-নায়িকা হয়তো একজন। সৃষ্টি-রঙ্গমঞ্চে নেচে চলেছে জীবন নৃত্যের তালে তালে।

* * *

দিন আসে দিন যায়। আলোর পিছনেই অন্ধকার এসে পূর্ণ করে এক একটা দিন। হারিয়ে যায় তারার দল আলোর বন্যাধারায়। মনে হয়, আর বুঝি দেখতে পাওয়া যাবে না তাদের ছায়াটি পর্য্যন্ত। কিন্তু আলো নিবে এলে আবার তারা টুপ্ টাপ্ ক'রে ভেসে ওঠে আকাশ-গঙ্গায়।

দিন গোণে কণিকা। সত্যি, কত দিনই না চলে গেল। দেখলে মনে হয়—এই তো কটা দিন। আঙুল গুণলেই বলা যায়। ভাবলেই বিস্ময়।

কিন্তু আর না। এইবার শেষ। তাদের ফেরবার লগ্ন এসে

গেছে। উঃ কি ভাবনাই না ছিল এতদিন। আজ কিন্তু কণিকার আনন্দ ধরে না। তারা ফিরছে। আবার সেই মায়া-ভরা মুগ্ধকরা কাকুদের স্নেহ-নীড়ে ফিরে চলেছে তারা।

কি মিষ্টি! স্বপ্নের মতই ভারী মিষ্টি সে ছবিখানা। কতবার ভেবেছে—চোখের সামনে স্পষ্ট ক'রে কতবারই না কণিকা দেখতে পেয়েছে সে ছবি। একলা ঘরে ছুটে ছুটে বেড়িয়েছে গান গেয়ে। বার বার বেশ পাল্‌টেছে। রাতের আবছা আলোয় জানলা ধরে আবেগে তাকিয়ে থেকেছে একরাশ দুষ্টু তারার দিকে। পূর্ণিমার চেয়েও বাঁকা চাঁদটার সঙ্গেই মিতালী পাতিয়েছে বেশী ক'রে।

লতাকে লিখেছে সে কথা। যেন এঁকেছে একপাতা আলপনা। —তারা যাচ্ছে। আগামী মাসেই তারা ফিরছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারা দু'জনেই।

'দু'জনা'।—কি ভালই না লেগেছিল কণিকার এ কথাটা লিখতে। বড় ক'রে মোটা ক'রে কালি দিয়ে লিখেছিলো লতাকে এই কথাটা।

হাস্থক লতা। হোক না বিস্মিত। কিন্তু সত্যিইতো তারা দু'জনাই। অবনী আর কণিকা। কণিকা আর অবনী।

কোন চুক্তি নয়। সহজ স্বাভাবিক ভাবেই তারা সম্মত হয়েছে পরস্পরে। মিষ্টি মধুর সে স্বপ্ননীড় দু'জনকেই এবার ফিরিয়ে আন্‌ছে অচ্ছেদ আশা দিয়ে।

উঃ সেদিনটা কি দুঃসহ সুন্দরই না তাদের জীবনে। যেদিন শেষ বোঝাপড়া ক'রে নিয়েছে তারা সেই সন্ধ্যে বেলায়, সেই সী-বীচের একটা অতি নির্জ্জন মায়াভরা নগ্নশিলায়।

ঝির ঝিরে হালকা হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য সাদা সারস। একটু দূরে একপাশে ঝাউ গাছের মধ্যে বাতাস বইছে শির্ শির্ ক'রে। ভেঙে পড়ছে ঢেউগুলো বালির আঁচলে লুটিয়ে। এঁকে যাচ্ছে নানা আকারের কতই না ফেনার আলপনা। দূরে একটা একটা ক'রে ফুটে উঠছে তারারা। সমস্ত জায়গা জুড়ে একটা নিরলস অফুরন্ত অবসর।

কোন তাড়া নেই। কোথাও নেই কোন ব্যস্ততা, সর্ব্বত্রই শান্ত মধুময় স্নিগ্ধ পরিবেশ।

চুপ চাপ বসে আছে তুটি প্রাণী। তাকিয়ে আছে সামনের অতল অসীম সফেন সমুদ্রের দিকে। তু'জনেই স্বপ্নে বিভোর। একটি নর —আর একটি নারী। ধুলি ধূসর মাটির পৃথিবীর রংমহলের তুটি রঙিন পুত্তলি।

—কি ভাবছো অমন করে?

অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভাঙলো একজন। সাড়া জাগলো আর একজনের চেতন-হারা মনে। সত্যি কি ভাবছে সে? এমন সময়, এমনি পরিবেশে একজন প্রেমমুগ্ধর পক্ষে কি ভাবা সঙ্গত? পাশে রয়েছে শত কামনা বাসনার না-ভোলা ধন। মাথার ওপর জ্বল্ছে রাতের সহস্র দীপালী। সামনে পড়ে আছে নীলাম্বুরাশি—অকূল সমুদ্র।

—কি, কথা বলছো না যে? কি ভাবছো অমন করে?

আবার এক টুকরো সুরের ঝঙ্কার। কী মিষ্টি,—কতই না ভাল লাগা আলগোছা প্রশ্ন?

এবার সাড়া দিল অবনী অস্ফুটস্বরে ঃ

—কিছু না। শুধু দেখ্ছি। আর সমস্ত পৃথিবী জুড়ে খোঁজবার চেষ্টা করছি একজনকে।

—কি দেখলে?

—দেখলুম ঃ "জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী
অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা-একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।"

—হাউ নাইস্! কিন্তু খুঁজে পেয়েছো তাকে?

কথা নয়। মনে হলো যেন ক্ষরে পড়লো এক ঝলক্ মধু মৌচাক থেকে অসাবধানে।

—পেয়েছি। তবে শঙ্কা; এই বুঝি হারিয়ে যায়। সে যে অ-ধরা। তাই ভাবছি-তাকে জনম ভোর বরং খোঁজাই ভালো। ধরে রাখবার চেষ্টা ক'রে লাভ নেই।

কি সুন্দর ক'রে কথা বলে অবনী। ভারী ভালো লাগে কণিকার। চাপা স্বরে বলে ঃ বোকারাই এ কথা বলে।

উচ্ছল কণিকা এবার দুলে উঠলো এক আবেগ শিহরণে। দু'হাত তার তখনও ধরা অবনীর শক্ত মুঠিতে। বললো ঃ মুঠোর মধ্যে পেয়েও যারা গ্রহণ করতে জানে না, শুধু দুর্ব্বলই নয় তারা, দুর্ভাগা।

—কিন্তু তুমি তো জানো কণি, জোর ক'রে পাওয়ার মধ্যে জয়ের তৃপ্তি থাকলেও চরম পাওয়ার পরম শান্তি থাকে না। চেয়ে পাওয়ার চেয়েও, না চেয়ে পাওয়ার সুখ অনেক।

—হয়তো তাই। তবে আমার ধারণা ওতে তৃপ্তি নেই। শান্তিও যথার্থ মেলে কি না সন্দেহ।

—তার মানে? আরো শক্তভাবে অবনী চেপে ধরে কণিকার নরম হাত দুখানা।

কণিকা এবার আলতো ভাবে তার মাথাটা রাখে অবনীর কাঁধের ওপর। বলে—খুব সোজা। সাধনা ক'রে পাওয়ার ভেতরই সিদ্ধির যথার্থ আনন্দ ও তৃপ্তি। সজ্ঞান চাওয়ার মধ্যেই থাকে সতর্ক আগ্রহ যত্ন। সার্থক মূল্যও পাওয়া যায় তাই।

তন্ময় হয়ে তাকায় অবনী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কণিকার দিকে। দীপ্ত চোখের কোণে কোণে কি যেন দেখতে থাকে গভীর ভাবে!

কণিকার চুলগুলো এক ঝলক বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এক সময়। সমস্ত মুখখানা ঢেকে যায় অবনীর। ভারী মিষ্টি লাগে। কণিকাকে ভারী সুন্দর লাগে আজ তার। সন্তর্পণে হাত দুটো ছেড়ে তাকে টেনে নেয় বুকের ওপর ধীরে ধীরে।

অবনী সত্যই অদ্ভুত। আশ্চর্য্যও বটে।

কেঁপে ওঠে কণিকা। অবস্ হয়ে যায় তার দেহ। জড়িয়ে যায় তার

কথা ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট হয়ে। কিছুক্ষণ থেমে বলে : আমি তোমার না-পাওয়া ধন হয়তো। কিন্তু তুমি আমার কাছে তা নও। তোমার প্রেমই আমার সিদ্ধির অমেয় লাভ।

অবনীর সবল হাত দুটো আরও শক্ত হয়ে ওঠে। দোলা লাগে বুকখানায়। প্রবল উচ্ছ্বাসে বলে : না কণি, অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকীই। তুমি আমার সত্যই অন্তরব্যাপিনী।

কী মিষ্টি। কত মধুর। কেমন বিস্ময়করই না সে স্বপ্নক্ষণ। বিধুত দুটি প্রাণ যেন নিমেষে হারিয়ে গেল লক্ষ কোটি সুনীল জল-কণায়। মাটির পৃথিবীর শ্যামলিমা, আর আকাশের ঘন-নীলিমা যেন মিশে গেল একাকার হয়ে। যা রইলো, তা শুধু মাত্র স্মৃতিই। যাতে গাঁথা থাকলো কেবল দুটি মন—একটি আশা, আর একটুকরো অমেয় তৃপ্তি।

*   *   *

কণিকা ফিরে আসছে। দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে ফিরে আসছে এক নতুন রূপ আর রং নিয়ে। লতা জানে। ডাক্তার কাকু শুনেছেন। বন্ধুবান্ধব সকলেই অনুমান করেছে—এ প্রত্যাগমন বড়ই সুখের তার। বড়ই গর্ব্বের।

কণিকা আর অবনী সকলেরই প্রিয়। শুধু তারা কেন, সমস্ত দেশ আজ এগিয়ে আসছে অবনীকে অভিনন্দন জানাতে। আজকের দিনে তার প্রয়োজন বড়ই বেশী। তার নিরলস সাধনার সিদ্ধিফল এবার যে ভাগ করে দিতে হবে সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে। অনেক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে সরকার তাকে সুযোগ দিয়েছে। সাহায্য করেছে।

তাই এ শুধু তাদের ফিরে আসা নয়। জয়ীর প্রত্যাগমন। সার্থক হয়েছে কণিকার জীবন এতদিনে। সফল হয়েছে তার জীবনের স্বপ্ন। সে শুধু ডাক্তারই নয়। তার স্থান আরও ওপরে। সে অবনীর সহকর্ম্মিণী—সে নিজেও এখন ক্যানসারের একজন বিশেষজ্ঞ। দেশের

আশু প্রয়োজনে তারাই আজ যজ্ঞের হোতা। দেশের ঐ রোগের বিনাশকল্পে তাদেরই ওপর সরকার দিয়েছে পরম দায়িত্ব।

আনন্দ হচ্ছে কণিকার কাকুর কথা ভেবে। তাঁর আশা, স্বপ্ন আজ কণিকা পেরেছে সফল ক'রে তুলতে। কতদিন হল কাকুকে সে ছেড়ে এসেছে। আজ আবার ফিরে যাচ্ছে তাঁর স্নেহ-নীড়ে।

কত আয়োজন করেছেন তিনি। কত রঙীন কল্পনার ছবি আঁকছেন বসে বসে। অবনী তার প্রিয়। প্রিয়তম কণিকা। দু'জনকে এবার আর ছেড়ে থাকবেন না তিনি নিশ্চয়। বাঁধনের আয়োজনে সত্যিই ব্যস্ত। নিজের জীবনে যা পাননি,—তাদের দিয়ে পুরিয়ে নেবেন সে শূন্যতা।

কণিকার জীবনে শুধু আশা মেটানো নয়, তাকে প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে তার কত স্বার্থত্যাগ, কত সাধনা। যে সংসার থেকে পলাতক তিনি, আজ সেই সংসারেরই মধুর আবেষ্টনী রচনায় বড় উদগ্রীব তাঁর মন প্রাণ। অবনীর সঙ্গে কণিকার বিবাহ দিয়ে একটা পরম সুন্দর সংসার গড়ে তুলতে কতই না তাঁর ব্যাকুল বাসনা।

শুনেছে কণিকা। লতার কাছ থেকে কোন খবর পেতে বাকি থাকেনি তার। জেনেছে অবনী। আনন্দে কেঁপে উঠেছে কণিকার হৃদয়টা অবনীর সহজ স্বীকৃতিতে।

—শুনছো কাকু কি বলেছেন?

—না, তিনি বহু হাজার মাইল দূরে আছেন। তাঁর কথা ঠিক কানে আসেনি।

কণিকার রহস্যে অবনী হেসে ফেলে।

—আরে তা বলছি না! পড়েছো তাঁর এ চিঠি?

—না ওটা তোমার পোষ্টবক্সে এসেছিল।

—আরে দূর! রাগ ধরে অবনীর এবার। বলেঃ ভারী দুষ্টু তুমি। সত্যি কিছু শোননি।

নীরব থাকে কণিকা। আরো ডুবে যায় রচনাটার গভীর বিষয়ে। এ লেখাটা আজই তাকে শেষ করতে হবে।

আবার কথা বলে অবনী। ঃ বলি, আমি কি একটা পাথরের সামনে বসে আছি ?

পাতা ওলটায় কণিকা নিঃশব্দে।

ভারী অস্বস্তি লাগে অবনীর। আর সহ্য করতে পারে না। —চিঠিটা হাতে করে এবার উঠে আসে কণিকার পেছনে। তারপর তার কাঁধ দুটোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলে ঃ এই দেখো কি লিখেছেন ?

কণিকা তখন আর না দেখে থাকতে পারে না। পড়েছিলো কাকুর কথাগুলো—"ওর ভার সব তোমার ওপর। ও তোমারই। তুমিই ওকে গড়ে নিও মনের মত.........।"

'ও তোমারই'। সত্যিই কত আশ্বস্ত হয়ে আছেন কাকু। অবনীও জানে কণিকা, তারই। বুঝেছে কণিকা, অবনী সত্যিই তার।

কিন্তু এত সুখের মধ্যেও কণিকা অবনীর চোখ থেকে নীরবে ঝরে পড়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু। দেশে ফেরার এ শুভ লগ্নে বেজে ওঠে দুজনারই অন্তরে সুগভীর ব্যথার রাগিণী।

মেজর বোস নেই। আজ কয়েকদিন হলো চিঠি পেয়েছে তারা হঠাৎ হৃদরোগে সে মহান ব্যক্তির ঘটেছে জীবনবসান।

কণিকা অবনীর বুকখানা ফেটে গিয়েছিলো সেদিন। মেজর বোস তাদের জীবনে জ্বালিয়ে গেছেন তাদের সাধনার হোমাগ্নি। তাঁর আদর্শ আর অনুপ্রেরণাই তাদের অমূল্য সমীধ। মেজর বোসের দয়া আর সাহচর্য্য না পেলে কিছুতেই তারা দাঁড়াতে পারতো না।

অবনী তার নিজের সন্তানের চেয়ে বড় ছিল। দেশে ফিরে আনন্দে অবনী কণিকার ভরে যাবে সমস্ত হৃদয় দুকুল ছাপিয়ে। তবু সব কিছুর মধ্যেই বাজবে একটা নীরব অথচ মর্ম্মন্তুদ আশা-কান্না।

* * *

শুধু কণিকা নয়। অবনীও আজ কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছে এক উদাসীন ভাবনায়। দেশে ফিরছে সেও আজ। কত সুদীর্ঘ কাল বাদে ফিরে যাচ্ছে সে নিজের দেশে।

ভুলে গিয়েছিল অনেক কিছুই। ধুলো-জমা নিজের জীবনের আবছা পাতাগুলো নূতন ক'রে দেখবার অবসর পায়নি এতকাল। প্রয়োজনও দেখেনি সে সবের। কেবল কাজ আর কাজ। কাজের নেশায় এত-দিন ছিল বেহুঁস্ হয়ে।

আজ আর সেদিন নেই। মিলেছে একটু অবসর। অনন্ত সমুদ্রের বুক চিরে ভেসে যাচ্ছে তাদের 'ভিক্টোর' জলযানখানা। এখনও বেশ কিছুদিন কাটাতে হবে জাহাজে তাদের। প্রচুর অবসর। শুধু চিন্তার জাল বোনা অলস ভাবে।

ছবির মতন ভেসে আসে অবনীর কত কথা আজ। দেশ ছেড়ে চলে এসেছে এক আধটা বছর নয়। সুদীর্ঘ কুড়িটা বছর কেটে গেছে বিদেশে তার।

বাড়ীর খবর যা পায় তা তাদের বুড়ো সরকারের চিঠিতে। তাও মাঝে মাঝে। চিঠিতেই জেনেছে বাবা মারা গেছেন তীর্থস্থানে। একমাত্র বোনটিও মারা গেছে জলে ডুবে। তার যা কিছু সবই সরকার-মশাই চালাচ্ছেন এখন। বাড়ীতে কেউ নেই।

সত্যি, ভগবানের রহস্য বোঝা ভার। সব কিছু দিয়েও কেমন মজা ক'রে সব কিছু কেড়ে নেন চোখের সামনে থেকে। কি নেই অবনীর? কে নেই তার? বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন সবই ছিল তার। তবু সবই মিথ্যে। সব কিছুই যেন কল্পনা আজ।

মেজর বোসই তার পরম ভরসা ছিলেন। সব কিছুই তিনি দেখা শোনা করতেন। বিপদে আপদে সহায় হোতেন। বাবার অভাব কিছুমাত্র বুঝতে দেন নি। এখনও সম্পত্তি যা আছে, তা কম নয়। কিন্তু অবনী ভাবে—কি হবে ওসবে তার? ও সম্পত্তি অভিশপ্ত। তাই, ঠিক করেছে ও সমস্ত সে দান ক'রে দেবে দশের সেবায়।

কণিকার কাছে ভেবেছিল সব কিছু খুলে বলবে সে। দেখাবে বুকখানা চিরে কত নিঃস্ব সে। কতই না অভিশপ্ত তার জীবনখানা। সব পেয়েও জীবন ভোর কি ব্যথাই না বহে চলেছে সে।

কিন্তু পারেনি। অনেক করেও অবনী নিজের কথা, বংশের কথা শোনাতে পারেনি তাকে। কি হবে অতীত পরিচয়ে? অতীত তো জীবন নয়। ওতো মৃত্যুর সামিল। নাইবা বললো কণিকাকে সব কথা।

কণিকার কথাও কোনদিন জানতে চায়নি সে। কথার ছলে কখনও পুরনো প্রসঙ্গ উঠলেও, সাবধানে তা এড়িয়ে গেছে। ভেবেছে কিইবা লাভ ওতে? সে তাকে জানে মনে প্রাণে। সে তাকে চিনেছে প্রতিদিনের সুখ দুঃখের সহস্র অভিজ্ঞতাতে। সেইটাই তো সব। আর ভবিষ্যত তো তাদের স্বপ্নে ভাগ ক'রে গড়া। তারপর আর কিসের প্রয়োজন সব-কিছুর?

নিজের কথা বলতে একটা লজ্জা অনুভব করেছে অবনী। যেটুকু শুনেছে কণিকা তাই ঢের। বাবা নেই। মারা গেছেন। বোনও মারা গেছে। আজ কেউ নেই তার। —এইটুকুই জানুক না সে সব কথা বলে।

তবু আজকে সব কিছুর মধ্যেই কণিকার সাহচর্য্য অবনীর মনে এনেছে একটা পরম আশ্বাস আর সান্ত্বনা। তার মধ্যেই অবনী খুঁজে পেয়েছে বাবার স্নেহ, মায়ের ভালবাসা। নিঃস্ব জীবনটা তাই আবার ভরে উঠেছে তার অনেক কিছু পেয়ে। মনে হচ্ছে সবই আছে তার। হারিয়ে যাওয়া সবই আবার ফিরে পেয়েছে অবনী।

একটা মুহূর্ত্ত আর ছেড়ে দেবেনা কণিকাকে সে। জীবন দিয়ে আট্‌কে রাখবে তাকে প্রেমের বাঁধনে বেঁধে। কণিকা সব দিয়ে ভরে তুলেছে তার জীবন। আশাবরী রাগিণীতে নিত্য নূতন সুর ভেঁজে রচনা করেছে সুখ-শান্তি ভরা কত না গানের লহরী,—মধুরতম ঝংকার।

নদীরা চলে যে যার পথে। কেউ ক্ষীণতোয়া, কেউ খরস্রোতা। কারুর বুকে খেলে জোয়ার ভাটার নিত্য খেলা। কারুর স্রোত হয় একমুখী। সুগভীর তল আর জলরাশি নিয়ে কেউ গরবিনী চালে চলে ঢল্ ঢল্ করতে করতে। কেউবা স্বল্প পরিবেশে অল্প জলে ছল ছলাৎ করে নেচে ধায় লক্ষ-ফেনার ঝুমুর পায়ে। গতি কিন্তু সেই একই দিকে সাগর তলে। সেখানে এসে আপন, আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সকলেই সুর ধরে এক মহা ঐক্যতানের। মহানের মহৎ ব্রতে সে সম্মিলিত আত্মদান হয়ে ওঠে তখন মহনীয়।

দেশে ফিরে এসে অবনী কণিকা নিশ্চিন্তে কাটাতে পারলো না কিছুকাল। সারা দেশ জুড়ে সুরু হয়েছে নব জাগরণের মহাযজ্ঞ। তাতে তাদের নিঃশেষে হাত মেলাতে হলো। সরকারী মন্ত্রণালয়ে ঘন ঘন আহ্বান অবনীর কাজের পরিধিকে করলো সুবিস্তৃত। নূতন স্কীম নিয়ে হাতে নাতে কাজ করতে, তাকে ছুটে বেড়াতে হলো এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে, শহর থেকে সুদূর পল্লী অঞ্চলে হাসপাতাল স্থাপনের কাজে সরকারকে তাকে সাহায্য করতে হলো কঠোর পরিশ্রম ক'রে। সর্ব্বত্রই তার কাজে ছড়িয়ে পড়লো ভূয়সী প্রশংসা। সংবাদ-পত্রে—বুলেটিনে—সরকারী নথিপত্রে প্রকাশ হতে লাগলো তার নূতন নূতন চিন্তাধারা। সরকার সাগ্রহে স্বীকার ক'রে নিলো অবনীর নূতন স্কীম। আর পুরস্কার স্বরূপ তাকে নিয়োগ করলো স্বাস্থ্য দপ্তরের যোগ্য পদে।

অবনীর গর্ব্বে আত্মীয়-স্বজন, কাকু, লতা সকলেই দুলে উঠলো। আর কণি? পাহাড়ী ঝর্ণার মতন উচ্ছ্বাসে মত্ত নয়,—অতল সমুদ্রের সুগভীর স্তব্ধতার মতন গর্ব্বে আর প্রেমে হলো ভাব-স্তম্ভিত।

এত সুখ, এত আনন্দ কি ক'রে সইবে কণি? অফুরন্ত শান্তির নিত্য দোলায় তার প্রাণ মন যে ফেটে পড়তে চাইছে আজ শতধাভিন্ন হয়ে।

সকলের মুখে একই স্তুতি, একই প্রশংসা—সত্যই তুই ভাগ্যবতী কণি। তোর মতন ভাগ্য ক'জনার ? অমন লোকের জীবনসঙ্গিনী হওয়া—এ যে শত জন্মের সৌভাগ্যফল।

শোনে কণিকা। দিনে রাতে শুনে শুনে তবু শোনার লোভ সামলাতে পারে না। ভগবানের আশীর্ব্বাদ ঝরে পড়ে অ-বাঁধ ধারায়। তবু তৃপ্তির চরিতার্থতা কৈ ?

সেও বসে থাকতে পেলো না। তাকেও কাজে লাগতে হলো অবনীর সঙ্গে সমান তালে। ছু'জনার চোখে নূতন স্বপ্ন। কাজে অমেয় স্ফূর্ত্তি।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যা, তা হলো তাদের নিজের হাতে গড়া 'অণিমা-সেবা-সদন'। শহরের এক প্রান্তে সেটা তৈরী হচ্ছে কয়েক বিঘে জমি ঘিরে।

অবনী-কণিকার নূতন স্কীমে গড়ে উঠছে এটা। অবনী তার মার নামে তৈরী করছে ঐ সেবাসদনটা। বাকি ব্যয় বহন করবে সরকার। কণিকার হাতে থাকবে এর পরিচালনার দায়িত্ব।

জীবনভোর যে স্বপ্ন আর আদর্শ গড়ে উঠেছে তার মনে—তাকে রূপ দেবার এক দুশ্চর ব্রত আছে তার সামনে উপস্থিত। গর্ব্বে দুলে উঠছে তার মন। কিন্তু সংশয়। পারবে কি ঠিক সে এ গুরু দায়িত্ব বহন করতে ?

অবনী আশ্বাস দেয় ঃ তুমি ভয় পাচ্ছো কেন কণি ? আমি তো রইলুম। সরকার ব্যয় বহন করবে। কিন্তু আমার ইচ্ছা এর পরিচালনার ভারটা তুমিই নাও।

—কিন্তু আমি কি পারবো ?

শঙ্কিত কণিকা মুখ তুলে তাকায় অবনীর দিকে।

—নিশ্চয় পারবে। আমরা যে নূতন স্কীম করেছি, ঠিক সেই ভাবেই এখানে কাজ আরম্ভ করবো। আর এ-আশা আমার নিশ্চয় আছে যে তোমার সক্রিয় চেষ্টায় তা সার্থক হয়ে উঠবেই।

—তুমি আমার সহায় হলে আর আমার ভয় থাকবে না।

—সে কথা বাহুল্য কণি।—অবনী কণিকার চিবুকটা তুলে ধরে আল্‌তো ভাবে।—তোমাকে তো বলেছি আমি, এটা আমার মার স্মৃতি। এর পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের তু'জনারই। তুমি কি এগিয়ে আসবে না আমার এ স্বপ্নকে সফল করে তুলতে ?

অভিভূত কণিকা। বলে কি অবনী ? এ মহাযজ্ঞে কণিকা তার পাশে থাকবে না ? তার স্বপ্ন কি কণিরও স্বপ্ন নয় ? অবনী কি জানে না কণিকার জীবনের এখন একতম ব্রত—তারই অনুগামিনী হওয়া ? তারই আদিষ্ট পথে তারই হাত ধরে সমান তালে চলা ?

সরে আসে কণিকা অবনীর বুকের কাছে। বলেঃ তুমি একথা কেন বলছো বলতো ? এ-কাজ কি আমার নিজের নয় ? এ স্বপ্ন কি শুধু তোমারই ?

আবেগে অবনী জড়িয়ে ধরে কণিকাকে পরম তৃপ্তিতে। ভরে যায় তার মনপ্রাণ। ভাবে, সার্থক সে। সার্থক তার জীবন কণিকাকে পেয়ে।

—না, না কণি। রাগ করো না। এ-কাজ, এ-আশা কারুর একার নয়। সব আমাদের—তু'জনের। তু'জনেই একে সার্থক করে তুলবো। মা আমাদের নিশ্চয় আশীর্ব্বাদ করবেন স্বর্গ থেকে।

অধীর অবনী সেদিন বুঝেছিল কণিকা তার যোগ্য সঙ্গিনী। তার সার্থক সহধর্ম্মিণী।

দেখতে দেখতে কটা বছরের মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়ালো 'অণিমা-সেবা-সদন'। নূতন পরিকল্পনার কাজ সুরু হলো সেখানে। এতবড় ক্যানসার হস্‌পিটাল দেশের মধ্যে এই প্রথম। এলো বিদেশ থেকে এক্সপার্টরা। একবাক্যে সকলেই স্বীকার করলো এ সত্যিই অভিনব।

সরকারও পুরোপুরি ভাবে এর সকল দায়িত্ব নিতে রাজী হলো এবার। 'অণিমা-সেবা-সদন' পুরোপুরি ভাবে স্বীকৃতি পেলো জাতীয়-প্রতিষ্ঠান হিসাবে।

সার্থক অবনীর সাধনা। ধন্য কণিকার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। মহান কাকুর আত্মত্যাগ।

আনন্দে সকলেই মূর্ত্ত। দেশব্যাপী নবজীবনের যজ্ঞ-কর্ম্মে তাদের সকল প্রচেষ্টা হয়ে উঠেছে সার্থকতর।

সরকার এর ভার তুলে নিলেও, পরিচালনার সব দায়িত্ব দিয়েছে অবনী-কণিকার ওপর। যাতে সেবাসদনের আরও উন্নতি হয় তার জন্য কাকুকেও বেঁধে দিয়েছে তার সঙ্গে।

আজ কণিকা ফিরে তাকায় তার ফেলে আসা জীবনের দিকে একবার। আর তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চায় আজকের এই জীবনটাকে। কল্পনা করে স্বপ্ন দেখার সেই লগ্নগুলোকে। আর হিসাব নেয় কতটা সফলতার পথে এগুলো আজ সে।

এক পরম তৃপ্তিতে ভরে যায় মনপ্রাণ কণিকার। জীবনে এত আনন্দ আর সৌভাগ্য যে পাবে—তা ছিল আশাতীত। বড় ভাল লাগে আজ। কোন অভিমান আর নেই। ভাবে, সত্যিই ভগবান যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্য।

সেদিনের সেই আঘাত, সেই প্রত্যাখ্যান যদি ভয়ঙ্কর হয়ে না আসতো—মোড় ফিরতো না কণির জীবনের। সাধনার চেষ্টাও থাকতো না তাহলে আর।

আজ সফল তার সাধনা। সুন্দর তার জীবন। আজ পূর্ণ সে। মনে পড়ে মার কথা। চোখের স্তু'পাতায় টল্ টল্ ক'রে ওঠে জল—বাবার স্মৃতিতে। কত সুখী হতেন তাঁরা আজ থাকলে। ডাক্তার কাকু মায়ের স্নেহ, বাবার ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেছেন তাকে। পৃথিবীতে এতবড় ভরসা, এতখানি নির্ভয় আশ্রয় আর কোথাও আছে তার ?

বলেছিল অবনীকে একদিন কণিকা সে-কথা জোর দিয়ে—হ্যাঁ, তিনিই আমার সব। আমার যা কিছু, সবই তাঁর দয়ায় গড়ে উঠেছে।

কৌতূহল বেড়ে যায় অবনীর। বলে: তিনিই তোমাকে মানুষ করেছেন? তোমার বাবা মা?

—খুব ছোটবেলাতে মারা যান। তারপর থেকেই আমি কাকুর কাছে মানুষ। তিনি নিজে অবিবাহিত। সংসার বলতে যা' তা কেবল আমাকে নিয়েই।

আশ্চর্য্য হয়ে অবনী শোনে কণিকার কথা।

—ভগবান কোন অভাব ওঁর রাখেননি। আশ্চর্য্য ওঁর ভাগ্য। কিন্তু উনি নিজের উপার্জন ছাড়া একটি কপর্দকও গ্রহণ করতেন না কারুর। আর নিজের জন্য যৎসামান্য যা ব্যয় হতো, তারপর সবকিছু বিলিয়ে দিতেন পাঁচজনের জন্য। আজও বহু ঘর ওঁর দয়ায় পালিত হচ্ছে। আর দেখলেও তো, নিজের শেষ অবধি যা ছিল সবই তোমার হাতে তুলে দিলেন সেবাসদনের জন্যে।

—ষ্ট্রেঞ্জ্। সত্যি অদ্ভুত জীবনই বটে।

অবনীর বিস্ময়ের যেন সীমা থাকে না। পৃথিবীতে আশ্চর্য্য হবার মতন কিছু নেই। বিচিত্র এই মানুষের মন। একটা মানুষ যেখানে রাত্রি দিন একটা পয়সাও ছিনিয়ে নেবার জন্য কি না করছে,—আবার তারই পাশাপাশি তারই মতন আর একটা মানুষ নিজের সবকিছু নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে কতই না উদগ্রীব। এক এক সময় মনে হয় মানুষ কতই না কুৎসিত, কত ভীষণ লোভী। আবার কোন সময় ভাবতেও বিস্ময় লাগে এই মানুষ কত সুন্দর, কতই না শ্রদ্ধার পাত্র।

—সত্যই তুমি ভাগ্যবতী কণি। এমন একটা মহৎ প্রাণের নিত্য সাহায্য পাওয়া—সত্যই সৌভাগ্য।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে অবনী একসময়।

কণিকা মাথা হেঁট করে নিঃশব্দে। অনেকের মত আজ অবনীর মুখেও ঐ 'ভাগ্যবতী' কথাটা শুনে লজ্জা করে তার।

—জানো কণি, অবনী আবার বলে—সব মানুষই পৃথিবীতে শক্তি নিয়ে আসে। শুধু চালনা আর পরিবেশের হেরফেরই কারুর জীবন হয় সার্থক, আর কেউ বয়ে যায় অকালে। সত্যি বলতো কাকুর মতন মানুষের কাছে তুমি যদি না এসে পড়তে, আজকের এ-জীবনকে তুমি কি ঠিক এমনি ভাবে পেতে ?

তন্ময় হয়ে গিয়েছিল অবনী। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল কণিকা তার কথা শুনতে শুনতে। ভাবে, অবনী যা বলছে তা কত সত্য ? কতটুকু শুনেছে সে তার সম্বন্ধে। কতখানিই বা জানে কণিকার অতীত জীবনের কথা ?

সত্যি, কাকু না থাকলে আজকের এ জীবন কণিকার কল্পলোকের সামগ্রী হয়ে থাকতো। সবকিছুই কাকুর জন্যে। এমনকি যে অবনী তার প্রাণ, সেও তো সেই কাকুর জন্যেই পেয়েছে সে।

আজকাল কেবলই মনে হয় কণিকার, সে যেন মিথ্যে কথা বল্‌ছে সব সময়। সবকিছু চুপি চুপি ঢেকে রাখছে। কেবলই তার ভয়—এই বুঝি সব জানাজানি হয়ে গেল। এই বুঝি জেনে ফেললো অবনী। তাই সর্ব্বদাই নিখুঁত ভাবে কথা বলে কণি, যেন কোনক্রমেই না বেরিয়ে পড়ে তার অতীতের সেই বিশ্রী নগ্ন কাহিনীটা।

আগে ভাবতো না এ নিয়ে বড় বেশী কণিকা। কিন্তু এখন অবনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যত নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে উঠছে—ততই কেমন যেন একটা দুশ্চিন্তা, কিসের যেন একটা ভয় তাকে অস্থির ক'রে তুল্‌ছে। একবার ভাবে সবকিছু বলবে অবনীকে একদিন। কিছু লুকবে না তার কাছে। আবার ভাবে—প্রয়োজন কি জোর ক'রে দুর্ভাগ্যকে টেনে এনে। সে তো কোনদিন জানতে চায়নি কি তার অতীত ? কি তার সব কাহিনী ? তাছাড়া, সত্যি যদি সেটা মূল্যহীন, নিছক একটা এ্যক্‌সিডেন্ট্ হয়—তবে এত শঙ্কা কেন তার ? জীবনে অনেক অঘটনের মতন সেও তো একটা ঘটনা মাত্র।

* * *

'অনিমা-সেবা-সদন'—অবনীর মার অক্ষয় স্মৃতি। জীবনকে ধন্য ভাবে অবনী আজ। মার কথা আজও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে তার মনে। কত মধুর কত সুন্দর ছিল তার মা। বংশের নাম রাখলো অবনী।

তবু কোথায় যেন একটা নীরব ব্যথা। বাবা, মা, বংশের কথা উঠলে কেমন যেন একটা সংকোচ ভাব এসে ঢেকে দেয় তার সমস্ত আনন্দ, সমস্ত উৎসাহ। সুখের সংসারটা তাদের কি ভাবেই না ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। মনে পড়ে বাবার কথা। একটা সংসার কত সুন্দর করেই না গড়ে উঠতে পারতো। অথচ কী নিদারুণ আঘাতেই না সব ভেঙে গেল।

কণিকাকে অবনী শুধু ভালই বাসেনি, তার ওপর কণিকার রয়েছে একটা পরম বিশ্বাস আর আস্থা। সে চিনেছে কণিকাকে প্রতিদিনের সুখ-দুঃখে, ব্যথা-বেদনায়। সত্যি খাঁটি সোনা কণিকা। কণিকাও বোঝে অবনী তার কতবড় ভরসা। সে তার সবকিছু দিয়ে তাকে জয় ক'রে নিয়েছে নিঃশেষে। সেও বুঝেছে অবনীকে।

কাজে ডুবেও আজকাল অবনী এমনি কত চিন্তায় মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কণিকার সঙ্গে তার বিবাহের সব ঠিকঠাক। অপেক্ষা করেছিল শুধু সেবাসদনের জন্যে। তাও মিটলো এতদিনে।

জীবন ভোর একটা চিন্তা, একটা স্বপ্নই ছিল অবনীর কাছে একতম হয়ে।—তা তার কাজ। কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছে আর একটা নূতন মিষ্টি মধুর জীবনের নিশানা। কণিকাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার একটা গোপন মাধুর্য্য। এতকাল যে বিষয়টা ছিল তার কাছে অত্যন্ত অসার, নিছক দুঃখভোগ মাত্র—আজ সেইটাই কেমন যেন রং-বেরং এর সুর তুল্ছে তার মনের কোণে কোণে। কণিকাকে সে পাচ্ছে, একেবারে নিঃশেষে অধিকার করছে—এই কল্পনায় কি মধুর একটা আবেগই না ভরিয়ে দিচ্ছে তার মন-প্রাণকে।

* * *

স্বপ্ন শুধু অবনীই দেখছে না। কাকুর মুগ্ধ-পরিবেশে আর একজনারও ঘুম হারিয়ে গেছে চোখ থেকে। কি যেন একটা অব্যক্ত আনন্দে আবেশ লাগে তার দেহে মনে।

আজ আর স্বপ্ন নয়। ভয় আর শঙ্কা জড়িয়ে নাগাল ছাড়া কল্পনাও নয়। কেবল মন আর ভাবনা নিয়ে অ-ধরার পিছু পিছু ধাওয়াও নয়।

সত্যিকারের পাওয়া। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখা, আর বুকে বুক রেখে মন দেওয়া-নেওয়া।

কোন বিশ্রী স্মৃতি, কোন কুৎসিত অতীত-কথা—ক্ষণমাত্রও মনে আসতে দিতে রাজী নয় কণিকা। সে নূতন—একেবারে নূতন। যা আছে—সব ভবিষ্যত। যা হচ্ছে—সব বর্ত্তমান।

অবনীর সঙ্গে কণিকার বিয়ে। বিয়ে কথাটা মুখে কেন, মনে আনতেও একরাশ লজ্জায় নুয়ে পড়ে সে যেন। একদিন এই বিয়ের কথা শুনলে সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরতো তার। কিন্তু আজ?

রঙীন হয়ে ওঠে কপোল দুটো কণিকার। এমন ক'রে নিজেকে যেন কোন দিন ভালো লাগেনি তার। এমন ভাবে সুন্দর হয়ে জীবন যেন ভরে ওঠেনি কখনো আর।

লতাকে জড়িয়ে ধরলো আবেগে কণিকা।

সত্যি? সত্যি বলছিস তুই?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ।—লতা গলা জড়িয়ে ধরে প্রিয় বন্ধুর। বলে, আমি নিজে গিয়ে দেখে এলাম। ওদের সরকার মশাই বর-কর্ত্তা হয়ে নিজে এসেছে। হাতে বাক্সটাও আছে। কি সুন্দর দেখতে যে বলা যায় না।

—তাছাড়া, লতা থামে না—ওটা ওর মা-ই রেখে গেছেন তোর জন্যে। ওদের পূর্ব-পুরুষদের আশীর্ব্বাদের হার। এটা নাকি ওদের

কুলপ্রথা। সত্যি, কি আন্‌লাকি ওর মা। আজকের দিনে যদি বেঁচে থাকতেন ?

লতার কথায় কেমন যেন একটু ব্যথার আতস লাগে কণিকার। মনের পটে ছবির মত ফুটে ওঠে তার বাবা-মার কথা। ভাবে, সেও আজ কত দুর্ভাগা। এত সুখের দিনে যাঁরা সবচাইতে বেশী সুখী হতেন—তাঁদের তিনজনেই নেই। মেজর কাকুর স্মৃতিও কি কম বেদনাদায়ক কণিকার কাছে ?

তবু একটা তৃপ্তি। তাঁরা না থাকলেও তাঁদের আশীর্ব্বাদ আজ ঝরে পড়ছে স্বর্গলোক থেকে। মেজর বোসের আশাও আজ সফল হয়েছে। তাঁর আদর্শে গড়া অবনী-কণিকা সার্থক ভাবেই রচনা করেছে তাদের নতূন জীবন।

কিন্তু সব থেকে সুখী বোধ হয় কাকু আজ। কণিকার জীবনে এত তৃপ্তি, এত আনন্দ—দু'কূল ছাপিয়ে তুলেছে তার অন্তরকে। আজ কাকু মুক্ত। কণিকার সকল দায়িত্ব, সব ভাবনা থেকে এতদিনে মিলবে তাঁর অবসর। অবনীর হাতে তুলে দিয়ে এবার সত্যিই তিনি নিশ্চিন্ত।

কণিকা তাঁর কেউ নয়। তবু ভগবান কেমন কৌশলেই না তাকে বেঁধে দিয়েছেন ভাগ্যের সঙ্গে। কিন্তু কাকু ক্ষুব্ধ নন তাতে। বরং আজ তাঁরই পরম শান্তি। যে স্বপ্ন তাঁর চোখে একদিন রং ধরিয়েছিলো কণিকা-অবনী তাকেই দিয়েছে সার্থকতর রূপ।

*　　　*　　　*

তবু লতার কথায় সেদিন কেমন যেন বিস্ময় বোধ করলো কণিকা। কোন গোপন একটা ভয়-জড়ানো স্মৃতি পাক দিতে লাগলো তার মনে একটার পর একটা। কেন কাকু অমন ক'রে বসে রইলেন ? কেনই বা এতটুকু উৎসাহ দেখালেন না তিনি এ ব্যাপারে ?

লতাকে আরও একবার কণিকা জিজ্ঞাসা করলো : সত্যি দেখলেন না ? মুখ ফিরিয়ে রইলেন ?

—হ্যাঁ, তাই শুধু নয়। হঠাৎ কেমন যেন মনে হলো তাঁকে। চমকে উঠলেন। তারপর দু'হাতে মুখটা ঢেকে উঠে গেলেন। ফিরেও তাকালেন না বাক্সটার দিকে।

—শরীর কি ভাল নেই ? কিন্তু আমিতো সকাল বেলায় তেমন দেখলাম না। লতার কথায় আপন মনেই কথাগুলো বললে কণিকা।

লতা বাক্সটা কণিকার হাতে দিয়ে বললোঃ কিছু ভাবিসনি। পরে দেখাবো ওটা। মনে হয়, ঠিক তাই। শরীর ও মন দুইই তাঁর এখন সুবিধের নেই। তা না হলে, অবনীর দেওয়া উপহার তিনি কখনো না দেখে থাকতে পারেন ?

অবনীর তরফ থেকে এ-হারটা এসেছিল আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। হীরের ওপর সুন্দর কাজ করা এ-হারটা কণিকা লতাকে দিয়ে কাকুর কাছে পাঠিয়েছিল দেখাতে।

কিন্তু এ কেমন আচরণ কাকুর ? এমন ভাবতো কখনো দেখেনি কণিকা। বরং কণিকার সব কিছুতে তিনিই হন বেশী আগ্রহী।

কণিকা তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয়। অবনী তাঁর প্রাণাধিক। তাদের মধ্যে মিলন, সেতো তাঁরই আশীর্ব্বাদ। তবে এ-ভাব আজ কেন তার ?

কণিকা ভাবে, সে নিজেই যাবে কাকুর কাছে। সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করবে তাঁকে এর কারণ। এমন শুভদিনে এমন নিরুৎসাহ কেন তিনি ? তার কি কোন অপরাধ হয়েছে ? অথবা, অবনীর তরফ থেকে কোন আপত্তি এসেছে ?

দ্বিধাগ্রস্ত মন বিক্ষিপ্ত হয় কণিকার। এত আশা—তবু কুয়াশা কাটে কৈ ? ফুলতো সব পাপড়ি মেলে ফুটলো—তবু সৌরভ ছড়িয়ে দিতে তার এত সংশয় কেন ? এখনো কি তাকে নিয়ে ছেলে-খেলার সাধ মেটেনি বিধাতার ?

*　　*　　*

ডাক্তার কাকুও ওদিকে তখন হয়তো এই কথাই ভাবছিলেন। সত্যি, এখনও কি সাধ মেটেনি বিধাতার? এ কি সমস্যা আজ নূতন ক'রে তাকে ক'রে তুললো বিচলিত?

অনেক ভেবেছেন তিনি। দিনে রাতে বার বার আপনাকে আপনি প্রশ্ন করেছেন অজস্রবার। তবু মীমাংসা কোথায়? সুন্দর সমাধানের হদিস্ কোথায়?

সংশয় তাঁর কেটেছে। বুঝেছেন মনে-প্রাণে, এতে কোন দোষ নেই। নেই কোন সমস্যা। কিন্তু অভিজ্ঞ মন এতে শান্ত হচ্ছে না কেন?

যখনই মনে পড়ছে অবনীর কথা—তখনই কেমন যেন চমকে উঠছেন কাকু। এ-ভাবনা এতদিন জাগেনি কেন? কেন মেজর বোসের কাছে ওদের বিবাহের ইঙ্গিত পেয়ে তখনই সবকিছু প্রকাশ করে বললেন না?

কণিকার জীবনের জন্য? কিন্তু আজই বা তাহলে বিচলিত হচ্ছেন কেন? কণির জীবনের সেই অশুভ ঘটনার কোন কথা অবনীতো জানে না। তিনি কিছু না বললে, কিছু প্রকাশ না করলে আর কোন বাধা নেই। কেউতো জানে না। কেবল তিনিই একা তাদের অন্তরায়। পৃথিবীতে এতবড় ঘটনার এখন তিনিই মাত্র একা সাক্ষী। মেজর বোস্ মারা গেছেন। না হলে এ রহস্য তার কাছে প্রকাশ করা যেতো।

অবনীর পরিচয় পাবার পর কাকু কতবার ভেবেছিলেন সব কথা খুলে বলবেন তাকে। কিন্তু পারেননি। একটা কথাও বের হয়নি মেজর বোসের কাছে। একটা আঁচড়ও টানতে পারেননি অবনীকে সে কথা লিখতে।

বার বার কণিকার মুখখানা ভেসে উঠেছে তার সামনে। অলক্ষ্যে কণ্ঠ চেপে ধরেছে কণিকার শক্ত তুটি হাত সজোরে। বলতে গিয়েও সবকিছু বিস্মরণ হয়েছেন তিনি।

ভেবেছিলেন লতার কাছে ধীরে ধীরে খুলে বলবেন কণিকার সে বিবাহের কথা। কিন্তু তার যুক্তি তর্কে শেষ পর্য্যন্ত বিভ্রান্তই হয়েছেন। বোঝাতে পারেননি ঠিক আসল সমস্যাটা কোথায় ?

এক গভীর বেদনায় কেবল হু হু ক'রে উঠেছে তার অন্তরাত্মা। স্নেহ, মায়া, মমতার শক্ত কাছিগুলো একটা একটা ক'রে বেঁধে অবস করে দিয়েছে তাঁকে। সব ভাবনা ভুলে ভেবেছিলেন যা হয় হোক্। এ তিনি কিছুতেই পারবেন না। এ তার অসাধ্য।

কিন্তু পরক্ষণেই ভেবেছেন—তাহলেও কি ওরা শান্তি পাবে জীবনে ? সার্থক হবে ওদের সব আশা আকাঙ্খা ? একদিন যখন সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে—সেদিন কি হবে ? সে মুহূর্ত্তে কি ওদের পায়ের তলায় শক্ত মাটিটা তলিয়ে যাবে না অতল গহ্বরে ? এতদিনের সুন্দর জীবনটা হয়ে যাবে না ধ্বংস ?

বিভ্রান্ত কাকু তীব্র রোগের যন্ত্রনায় যেন কুঁকড়ে ওঠেন। কণিকা অবনীর বিবাহের দিন যত এগিয়ে আসে—ততই এক অব্যক্ত চিৎকারে কেঁপে ওঠে তাঁর বুকখানা। কি করবেন ? কি করা উচিৎ ? কি করে সব কথা খুলে বলবেন অবনীকে ? কণিকাকেই কি রাজী করাতে পারবেন ?

এতদিন কাকুও এর গুরুত্ব বোঝেননি ! কিন্তু আজ আর এতবড় মিথ্যাটাকে চাপা দিয়ে রাখতে তার মন পারছে না। কণিকা না পারে, তাঁকে অন্তত সব কথা—কণিকার প্রথম বিবাহের ঘটনা অবনীকে খুলে বলতেই হবে।

অগ্নি সাক্ষী রেখে কণিকার মা একদিন তাকে অপরের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন। মন্ত্র পড়ে কণিকার স্বামী সিঁদূর এঁকে দিয়েছিলেন তার সিঁথেয়। সেই কণিকাকেই নূতন ক'রে আবার সম্প্রদান করতে হবে কাকুকে নিজের হাতে। অগ্নি সাক্ষী রেখে নূতন করে মন্ত্র পড়তে হবে সরবে। সেই সিঁথিতেই আবার সিঁদূর পরাবে অবনী।

....বিভ্রান্ত কাকু আর ভাবতে পারেন না। তবে স্থির সঙ্কল্প করেন, অবনীকে সব খুলে বলবেন। এ সত্যকে কখনো চাপা দেওয়া যায় না। একদিন তা প্রকাশ হয়ে পড়বেই। তার চেয়ে আগে থেকেই বলা ভালো।

* * *

ধীরে ধীরে লতাও শেষ অবধি শোনে কণিকার জীবনের সেই গোপন কাহিনী। চমকে ওঠে। স্তম্ভিত হয়। তবু সহানুভূতিতে কেঁদে ওঠে তার অন্তরাত্মা প্রিয় বন্ধুর সে নিদারুণ শোক-গাথায়।

বিভ্রান্ত সেও আজ। এতদূর এসে কি করে আজ এত বড় বাধাকে অতিক্রম করবে কণি? কাকুর যুক্তিকে অস্বীকার করতে পারে না লতা। অভিজ্ঞ মন তার বুঝতে পারে কাকুর কথার গুরুত্ব। কিন্তু কণিকাকে শান্ত করবে কি করে?

অবনীকে লতা চেনে। বোঝে কণিকা তার কত প্রিয়। হঠাৎ একদিনের মোহে তারা ভালবাসেনি পরস্পরকে। প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত্তের স্নেহ-প্রীতি দিয়ে বেঁধেছে তারা দুজনে দু'জনকে।

অবনী বুদ্ধিমান। সে নিশ্চয় সুবিবেচনা করবে। এটুকু নিশ্চয় বিশ্বাস করবে এতে কণিকার কোন হাত ছিল না। মা-মামা তাকে নিছক পুতুলের মতন চালনা করেছে মাত্র। বুঝবে কত নিষ্পাপ সে। কত পবিত্র কণিকার প্রেম।

কাকুর কথায় তাই সেও সাহস দিয়ে বলে: আমারও তাই মনে হয় কাকু। অবনীবাবু নিশ্চয় আসল ব্যাপারটা বুঝবেন। তিনি সুশিক্ষিত। সংস্কারের অন্ধতা নিশ্চয় তার মনকে বিভ্রান্ত করবে না।

—আমারও তাই বিশ্বাস। তবে কণিকে বোঝাই কি বলে? আমার মনে হয় তারই উচিৎ সব কথা অবনীকে খুলে বলা। না হলে, আমরা কেউ বললে—সেটা অন্য রকম হবে।

—কণিকে আমিই বুঝিয়ে বলবো। লতা কাকুকে সান্ত্বনা দেয়।
—ঠিক বুঝছি না, সে এই ঘটনাকে এত সিরিয়াস্ ভাবে নিচ্ছে কেন? সব কথা খুলে বলাই তো ভালো।

—আমি তাই-ই বলি। তুই-মা ওকে একটু বুঝিয়ে বলিস্। অবনীকে আমি আসতে লিখে দিয়েছি। ও বাইরে গেছে। কালই আসবে।

লতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় কাকুর কথায়। তারপর ধীরে ধীরে উঠে যায় কণিকার উদ্দেশ্যে।

কাকু একা বসে থাকেন ঘরে। ভাবেন, মানুষের জীবনের রহস্যের কথা। এক-একটা মুহূর্ত্ত। কত ক্ষুদ্র তার অংশ। অথচ কেমন ভাবে তাই সব ওলোট পালোট ক'রে দেয় সমস্ত জীবনের সব পরিকল্পনাকে। যখন সব সুখ এসে দাঁড়িয়েছে কাছে, তখনই এক অনিশ্চিত-বাধা নিঃশব্দে দাঁড়লো মাথা তুলে। কত তুচ্ছ সে! অথচ কত ভয়ঙ্করই না তার বিষক্রিয়া?

* * *

লতার কথায় কণিকাও আজ ভাবছে তার বৈচিত্র্যময় জীবনের কথা। এতবড় দুর্ভাগ্য আর আছে নাকি? যখনই সবকিছু তার পাওয়ার মুঠোর ভেতর—তখনই এক দুর্বার অভিশাপ এসে ব্যর্থ করে দিয়েছে সকল আশাকে। বার বার রুখে দাঁড়িয়েছে সে। বার বার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে নির্দয় ভাগ্যকে।

কিন্তু আজ? আজ কণিকার মনে হচ্ছে. আর যেন সে পারছে না। এক অসহায়তা, দুর্ব্বলতা কেবলই অবস করে দিচ্ছে তাকে। কি যেন একটা ভয়ে কেঁপে উঠছে তার সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো পর্য্যন্ত। ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে সকল উৎসাহ—সব মনবল নিঃশেষে। তাই জীবনের এই শুভক্ষণে কাকুর ঐ আকস্মিক প্রস্তাব তাকে যেন স্থবির করে তুলেছে।

দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে কণিকার লতার কথায়। প্রতিবাদ করতে গিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে কান্নার আবেগে। লতা সংযত হয়। গভীর স্নেহে সান্ত্বনা দেয় ঃ তুই এটাকে এতটা সিরিয়াস্ করে দেখছিস কেন বল্তো ? আমিতো এর মধ্যে কোন ভয়ের লক্ষণই দেখছি না।

কণিকা লতার কথায় জবাব দেয় না সহসা। কি যেন ভাবে। তারপর ধীরে ধীরে গম্ভীর ভাবে বলে ঃ তবে তোরাই বা এমন ভাবে এ-কথা ওকে বলতে কেন বলছিস ? যদি না ও বিশ্বাস করে ? যদি আমায় ভুল বুঝে সন্দেহ করে ?

—সন্দেহ কিসের ? তুই কি কোন অন্যায় করেছিস ?

—তা নয়। বিয়ের কোন কথা এতদিন তাকে কিছু বলা হয়নি, এটাকেই সে অন্য ভাবে নেবে। ভাববে, এর পেছনে নিশ্চয় কোন মতলব আছে। *নিশ্চয় কোন*.......

—অসম্ভব। কণিকার অসমাপ্ত কথার পিঠে মন্তব্য করে লতা— অবনীবাবু কখনই এতটা নীচ মনোভাবাপন্ন হবেন না।

লতার কথায় কণিকা ফিরে তাকায় তার দিকে। ঠোঁটের কোণে ভেসে ওঠে বেদনার এক টুকরো ম্লান হাসি। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে ঃ অতটা সহজ ভাবিসনি। জানিস, পুরুষ মানুষেরা ঠিক এই জায়গাতেই সব চাইতে বেশী দুর্ব্বল। তারা সব পারে। কেবল মেয়েদের ঠিক ঐ খানটায় তাদের সন্দিগ্ধ মন কিছুতেই সায় দেয় না। বিয়ে হয়ে গেছে,— স্বামী সিঁদূর দিয়ে ঘরে তুলেছে, ব্যস্, এইটুকুই যথেষ্ট। এরপর কোন পুরুষই আর সহজ বিশ্বাসে ফিরে তাকাবে না সেই মেয়ের দিকে।

সমস্ত দেহটা কেঁপে ওঠে লতার একটা অজানা আশঙ্কায়। কণিকার বক্তব্যর এই ইঙ্গিতটা মেয়েদের জীবনে কত যে ভয়ঙ্কর—তা সে ভেবে দেখবার একবার অবকাশ পায়নি আগে। কাকুও ঠিক এই দিকটা কখনো ভেবে দেখেছেন কি না সন্দেহ। সংশয়ে মন তার পিষ্ট হয়। বুঝতে পারে কী এক জটিল পরিস্থিতি ঘনিয়ে এসেছে আজ কণিকার জীবনে।

লতা এরপর আর সাহস ক'রে কিছু বলেনি কণিকে। সাগ্রহে আর উৎসাহ দেয়নি এরপর। শুধু ভগবানকে ডেকেছে। আর চোখের জল ফেলেছে নিঃশব্দে।

*　　　　*

কত তুচ্ছ, কত অবান্তর ঘটনা। এর কোন যে মূল্য আছে তা' ভাবাও যায় না। তবু এই তুচ্ছতার মধ্যেই কণিকা যেন শুনতে পায় এক অভিশাপের দুর্ব্বার পদক্ষেপ! প্রতি মুহূর্ত্তে কী এক যেন ভয়ে আতঙ্কে কেঁপে ওঠে তার ছোট্ট বুকখানা। বিতৃষ্ণায় আর ক্রোধে মনটা ভরে যায় কাকুর কথা শুনে। বলে: এ প্রশ্ন আজ আবার কেন তুলছেন, বুঝি না।

কাকু সহসা এর উত্তর দিতে পারেন না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে পরে বলেন: তুই অযথা রাগ করছিস। জানিস তো কি ভাবে তোর বিবাহটা হয়েছিল? তুই বা আমি তা' অস্বীকার করলেও সমাজ, আইন, ধর্ম্ম—এরা কি তা করবে? ভবিষ্যতে কোন কারণে সেই সত্য যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন? অগ্নি সাক্ষী রেখে তোর মা তোকে সম্প্রদান করেছিলেন। অমলবাবু সহধর্ম্মিণী জ্ঞানে দেবতা সাক্ষী রেখে তোকে ঘরে তুলেছিলন। সুতরাং ধর্ম্মতই বলিস, আর আইনতই বলিস —তার কোন বন্ধনই আজও সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়নি।

—আমি তা জানি না; স্বীকারও করিনি কখনও। গম্ভীর ভাবে কণিকা মন্তব্য করে কাকুর কথায়।—আপনি আজ অনর্থক ঐসব কথা টেনে এনে অশান্তি করছেন।

কণিকার এ-উত্তরের মধ্যে যে বিদ্বেষ ছিল, কাকুকে তা আঘাত করলেও তিনি শান্ত স্বরে বলেন: দেখ মা, একদিন আমিও ত স্বীকার করিনি। আর তা করিনি বলেই তোকে নূতন ক'রে জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছি। এমন কি অবনীর প্রসঙ্গে পর্যন্ত সহানুভূতির

সঙ্গেই উৎসাহ দিয়েছি। তবু আজ এই বুড়ো বয়সে সত্যকে আর অস্বীকার করতে সাহস পাচ্ছি না।

—এত বড় মিথ্যাটাকে সত্য বলে বড়াই করছেন? ভ্রুকুটিতে কণিকার তুই চোখ জ্বলে ওঠে এক হিংস্র শাপদের মতন।

—মিথ্যা রাগ করছিস মা। সান্ত্বনার সুরে কাকু পরিবেশকে আবার সহজ করবার চেষ্টা করেন। বলেন—বুঝি সব। তবু বলি ক'দিন বাদেই তোদের বিয়ে। এখন আর গোপন ক'রে রাখা উচিত নয়। সব কথা অবনীকে খুলে..........

—অসম্ভব। এখন অন্ততঃ তা কখনই হবে না।

কিন্তু বিয়ের আগেই কি তা বলা উচিত নয়? সে বুদ্ধিমান। বিদ্বান। তাকে সব কথা পরিষ্কার ক'রে বললে সেই এর অসারতা বুঝতে পারবে। বুঝবে তুই তাকে ঠকাসনি। তুই নিষ্পাপ। ফুলের মত পবিত্র।

—কাকু! চিৎকারের সুরে কণিকা থামিয়ে দেয় বৃদ্ধের সে অশ্রদ্ধেয় মতামতকে। চাপা কান্নায় কেঁপে ওঠে বুকখানা। ভিজে যায় চোখের পাতাগুলো। ভাবে এ আবার নতুন ক'রে কি বিপদের জাল বোনেন কাকু? জীবনের শেষান্তে এসে বৃদ্ধের এ-কি বুদ্ধিভ্রম? তিনি কি একবারও ভাবছেন না—তাঁর এ বাতুলতার পরিণাম কি?

* * *

মানুষ ভাবে এক আর হয় আর। পরিস্থিতি পালটে দেয় অকস্মাৎ ভাবে সমস্ত ভাবনাকে। মানুষ চেষ্টা করে আপ্রাণ শক্তিতে রুখতে। কিন্তু সব সময় তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। অপ্রতিরোধনীয় কি এক তুর্ব্বার শক্তি অবস ক'রে দেয় তার সকল মন-বলকে। ব্যর্থ হয়ে যায় সকল পাওয়ার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা।

সারা রাত ধরে একলা ঘরে কণিকা ভেবে চলে আপন মনে। কি ক'রে এড়াবে এই আকস্মিক বিপদকে। যাকে সে মনে মনে এতদিন

দূরে সরিয়ে রেখে দিলো—সেই আশঙ্কাই আজ সহসা কেড়ে নিচ্ছে তার সকল কিছুকে। বুঝতে পারে না কেমন ভাবে রুখবে? কি ক'রে মানিয়ে নেবে? মিলিয়ে নেবে নিজেকে এই নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্যে।

চোখের সামনে আজ কণিকার ভেসে ওঠে তার সমস্ত জীবনের কথাগুলো ছবি হয়ে। সেই ছোট্ট বেলার সুন্দর আনন্দময় জীবন—বাবা-মার কথা। তাঁদের ভবিষ্যৎ আশা, অশোকের কথা, আরও কত কি?

অশোকের কথা মনে পড়তেই স্থির হয়ে যায় তার সকল চিন্তা। জীবনে সেই তার সবচেয়ে বড় শত্রু। সে যদি না আসতো, প্রথমেই জীবনটাকে বিষিয়ে না তুলতো এমন করে—তাহলে কণিকা হয়তো মানিয়ে নিয়ে চলতে পারতো তার বিবাহিত-জীবনটাকে। যেমন ভাবে এ দেশের প্রায় সব মেয়েকে ঘাড় নীচু ক'রে মানিয়ে নিতে হয়। তা সে বিবাহিত-জীবনটা যত অশোভন আর অসহ্যই হোক না কেন।

রাত গড়িয়ে আসে। কণিকা ভাবে আজ রাতটাই শেষ সময়। কালই অবনী আসছে। কাকু তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন একটা বিশেষ প্রয়োজনে।

এই বিশেষ প্রয়োজনটা সারতে হবে কণিকাকেই। তাকেই নিজের মুখে শোনাতে হবে তার জীবনের সেই অভিশপ্ত কাহিনী। যার ওপর নির্ভর করবে তার আর অবনীর সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন। কাকু কতদূর ভেবে দেখেছেন কে জানে। তবে এইটুকু স্পষ্ট ক'রে স্বীকার করছেন যে অতবড় সত্যটাকে কোন মতে চেপে যাওয়া উচিত হবে না। অবনী নিশ্চয় বুঝবে। কণিকার প্রতি মন তার ভরে উঠবে সহানুভূতিতে। লতারও অগাধ বিশ্বাস এতে কোন অঘটন ঘটবে না। বরং সত্যকে চেপে যাওয়াই কণিকার পক্ষ থেকে অশোভন হবে।

কণিকাও চিন্তা করে। সারা রাত জেগে ভাবে। একবার নয়।

সহস্রবার মনকে সাহস দেয় কাকুর আর লতার কথার প্রতিধ্বনি তুলে। কিন্তু তবু সংশয় মুক্ত হতে পারে কৈ? কেমন যেন একটা ভয়-জড়ানো ভাব অবস ক'রে দেয় সমস্ত দেহ মনকে। ধীরে ধীরে টেনে আনে এক অসহায় অবস্থার মধ্যে।

প্রশ্ন করে। স্বগোক্তিতে উত্তর দেয়। সন্দেহ মেশানো অজস্র প্রশ্ন। কি ক'রে বলবে অবনীকে সব কথা খুলে? কি করে বোঝাবে আসল ঘটনাটা কি? কত বড় মিথ্যা তার ঐ বিবাহটা?

যদি অবনী ভুল বোঝে?

কেঁপে ওঠে কণিকা। বিভ্রান্ত হয়। উঠে ঘুরে বেড়ায় একলা অন্ধকারে।

যদি তাকে অবিশ্বাস করে? যদি মনে করে তাকে ঠকিয়েছে?

স্বামী পরিত্যক্তা সে। তিনি আজও বেঁচে আছেন কি না, কে জানে। যদি অবনী খোঁজ নিতে চায়? তারপরও কি বিশ্বাস করবে অবনী? ভাবতে পারবে কি, কণিকা ফুলের মতন নিষ্পাপ? নিষ্কলঙ্ক তার প্রেম?

আর ভাবতে পারে না কণিকা। আপন সুখ শান্তির সম্ভাবনায় অবনীকে ঘিরে যে স্বপ্ন সে দেখেছে এতকাল, নিমেষে মুছে যায় তা'। এক নিদারুণ ভয়ে কুকঁড়ে ওঠে তার অন্তরাত্মা।

ভাগ্যকে দোষ দেয় শতবার। এ কি তার ভাগ্যবিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস? আর যে পারে না সে সহ্য করতে। চিৎকার ক'রে ওঠে আপন মনে—না, না বলে। ভাবে, আর নয়। আর হারাতে দেবে না। কিছুতেই না। বলুক কাকু। বলুক লতা। কিছুতেই সেকথা শোনাতে দেবে না অবনীকে। যা হবার হয়, হোক।

রাত কত কে জানে। উন্মাদের মতন কণিকা পায়চারি ক'রে, বেড়ায় সমস্ত ঘরময়। এক অসহ্য জ্বালায় ছটপট ক'রে ওঠে। কাকুর প্রতি বিষিয়ে যায় সমস্ত মনটা। বৃদ্ধের বাতুলতার একি নিষ্ঠুর পরিণাম?

হারিয়ে ফেলে সুস্থ চেতনা কণিকা। হারিয়ে ফেলে সকল সংযম। এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ছুটে বেরিয়ে যায় কাকুর ঘরের দিকে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। কিন্তু টাল সামলাতে পারে না। পা-পিছ্‌লে গড়িয়ে পড়ে যায় নীচে। অন্ধকারে কেঁপে ওঠে বাড়ীখানা একটা চাপা-আর্ত্তনাদে।—

*　　*　　*　　*

পাতাল প্রবেশের কামনা শুধু সীতাই করেনি। আজও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এ-কামনা শত বুকের মধ্যে আগুন জ্বালাচ্ছে। শত কণ্ঠ চিরে নিরন্ধ্র অন্ধকারে বেরিয়ে আসছে আজও সেই কামনার আর্ত্তরব—মুক্তি দাও ভগবান! হে পৃথিবী দ্বিধা হও। এ চরম লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দাও।

কিন্তু পৃথিবী-মা কেবল সেই একবারই মেয়ের কান্না শুনেছিল। একবারই দ্বিধা হয়েছিল। আগ্রহে কোলে তুলে নিয়েছিল মেয়েকে। ঘুচিয়েছিল তার সমস্ত জ্বালা—দুরপনেয় কলঙ্ক।

তবু ডাকে। তবু আজও নিত্য শোনায় কাতর প্রার্থনা। আশা করে—যদি সত্যিই অমন নিঃশব্দে সে তলিয়ে যেতে পারে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহলে বাঁচা যায়। শান্তি পায় সকল জ্বালা জুড়িয়ে।

কণিকাও ডাকে। দিনে রাতে আজ তার একটিই কামনা কেবল—ভগবান তুলে নাও। মুক্তি দাও। আর যে সহ্য করতে পারি না।

সত্যিই, আর সহ্য করতে পারছে না কণিকা, আর একটা মুহূর্ত্তও বাঁচতে চাইছে না এই আলোর পৃথিবীতে। শুধু মৃত্যু। শুধু মুক্তি। নিঃশেষ-মুক্তিই তার একতমপ্রার্থনা।

অপূর্ব তার জীবন। বিস্ময় তার ভাগ্য-বিধাতার কৌতুক খেলা। বার বার সুধা-পাত্র তুলে ধরেছে তার পিপাসার্ত্ত অধর কোণায়। বার বার কপট অট্টহাসিতে চুরমার ক'রে ভেঙে ফেলে দিচ্ছে পাত্রখানা। তৃষ্ণার্ত্ত বক্ষে নিদারুণ জ্বালায় চিৎকার ক'রে উঠছে কণিকা। কিন্তু এতটুকু সুধা তুলতে পারছে না মুখে। শুধু পাচ্ছে—কেবল হাতের

মুঠোয় ধরবার অধিকার পাচ্ছে মুহূর্ত্তের জন্য। তারপরই ব্যর্থ হাহুতাসে চেপে ধরছে নিজের বুকখানা না-পাওয়ার চরম বেদনায়। সমস্ত ঘরখানা কেঁপে উঠেছিল সে দিন তার বুকফাটা কান্নার দমকে দমকে।

চোখের সামনে কাকুকে শুধু দেখতে হয়েছিল একটা বিরাট মহীরুহ কী করে মাটি দু'ফোঁড় ক'রে আঘাতে দুম্‌ড়ে্‌ ভেঙে, ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়—সেই ভয়াবহ দৃশ্য।

তিন দিন তিন রাত। শশ্মানস্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিরাট বাড়ীখানা। তিন দিন তিন রাত ঘরের কোণে কোণে শুধু গুম্‌রোতে লাগলো একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস—কান্নার বদ্ধ বাতাস। তিন দিন তিন রাত কেবল শোনা গেল একটা ধীর অথচ গম্ভীর পদশব্দ। একটানা চলা ফেরা করছে নিস্তব্ধ বারন্দায়।

লতার ডাকে উঠে বসলো কণিকা। যখন অলোয় তাকে আবার দেখা গেল চিনতে পারলো না সহসা কেউ। লতার নিজেরই মনে হলো—এ বুঝি আর কেউ। কণিকা নিশ্চয় নয়।

সত্যিই এ সেই কণিকা নয়। অন্য কেউ। অন্য কোন মানুষের মূর্ত্তি।

লতাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো কণিকা। হা-হা-হা! হা-হা-হা! হাসির যেন শেষ নেই আজ তার। সমস্ত ঘরখানা যেন ফাটিয়ে ফেলতে চইলো হাসির শব্দে।

জড়িয়ে ধরতে চাইলো লতা কণিকাকে দু'হাতে। কিন্তু মুখ তুলতে গিয়ে একরাশ জলে ঝাপসা হয়ে গেল তার চোখের দৃষ্টি। প্রিয় বন্ধুর হাসির হুল্লোড়—বুকফাটা এক কান্নার সুরে বদ্ধ ক'রে দিলো তার সমস্ত শ্রবণ শক্তিকে।

চিনতে পেরেও ঠিক যেন চিনতে পারলো না কণিকা লতাকে। তাই পরক্ষণেই দু'হাতে ঠেলে ফেলে দিলো তাকে মাটিতে। চিৎকার করে ভেঙে পড়লো আবার কান্নায়। —চলে যাও। চলে যাও এখান থেকে। দূর হয়ে যাও। দূর হয়ে যাও।

তিন দিন তিন রাত্রির পর এই প্রথম আজ কান্নার সঙ্গে পাগলের মতন কথা কইলো কণিকা। '—দূর হও।' সমানে এই একটা কথা কেবলই চিৎকার করছিল কণিকা।

স্তম্ভিত হলো লতা। একি পরিণতি কণিকার? ছুটে এলো কাকু। কিন্তু কাকুকে দেখে আরও ভীষণ হয়ে উঠলো কণিকার রূপ। অর্দ্ধ-উলঙ্গ বেশে ছুটে এলো কাকুর কাছে। দু'হাতে কাকুর গলা টিপে ধরলো সজোরে। তারপর ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো—দূর হও। দূর হয়ে যাও।

কাকুকে বাঁচালো লতা। জড়িয়ে ধরে কণিকাকে জোর ক'রে শুইয়ে দিল বিছানার ওপরে। কিন্তু সেটা মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই কণিকার রূপ যেন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। ঘরের সমস্ত আসবাব-পত্তর দু'হাতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলতে লাগলো বদ্ধ উন্মাদের মতন।

সরে এলো লতা। পিছিয়ে এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন কাকু হাঁফাতে হাঁফাতে। ঝি-চাকরেরা উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল জানলা দিয়ে। কণিকা একটার পর একটা জিনিস ভাঙছে, আর চিৎকার করছে—দূর হও! দূর হও! দূর হয়ে যাও।

দু'চোখ ভরে যায় জলে। দু'হাতে কাকুকে জাপটে ধরে চিৎকার ক'রে উঠলো লতা।—একি হলো কাকু? এমন সর্ব্বনাশ কেন হলো ওর? ও যে পাগল হয়ে যায়। ও যে উন্মাদ হয়ে গেল।

সমস্ত বুকখানা জলে ভিজে গেল। কিন্তু তবু একটা কথাও ফুটলো না নিথর পাথরখানার মুখে। অনেক পরে লতা যখন মুখ তুল্‌লো তখন দেখলো—কাকুর দুই গাল বেয়ে কেবল নিঃশব্দে ঝরে ঝরে পড়ছে তপ্ত জলের ফোঁটাগুলো একটা একটা ক'রে।

রাত হয়ে এলো। ধীরে ধীরে লতা ফিরে গেল। কিন্তু কাকু নড়লেন না। একটুকুও চাঞ্চল্য দেখা গেল না তাঁর মধ্যে। পাথরের মত শুধু দাঁড়িয়ে রইলেন কণিকার দরজার গোড়ায়।

রাত গভীর হলো। অন্ধকার হলো আরও গাঢ়তর। সমস্ত বাড়িটা

নিঃশব্দে ডুবে গেল যেন সেই অন্ধকারের অতল তলে। চারিদিক নিঃস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শুনতে লাগলেন শুধু এক এক ঝলক হাসি, আর চাপা কান্নার গুমরনো শব্দ। আর সেই সঙ্গে একটানা সেই চিৎকার—দূর হও! দূর হও! দূর হয়ে যাও।

* *

দেখতে দেখতে কেটে গেল পনেরটা দিন। পনেরটা দিন বললে ভুল হয়, যেন পনেরটা মাস। না, না। যেন পনেরটা বছর।

মাত্র পনেরটা দিন কণিকার দীর্ঘ তিরিশ বছরের জীবনে কতই না তুচ্ছ—কতই না নগণ্য। কিন্তু এই মাত্র পনেরটা দিন যেন ধ্বংস করে দিল তিরিশটা বছরের তিল তিল ক'রে গড়ে তোলা জীবনটাকে। দিনে রাতে অগুন্‌তি ডাক্তার। দিনে রাতে চার পাঁচটা নার্সের চললো অবিরাম সেবা শুশ্রষা। শিশি বোতলে ভরে গেল আলমারিটা। বরফ আর ফ্যানের হাওয়ায় সব সময় শীতল ক'রে রাখা হলো কণিকার ঘরখানা। কিন্তু সবই ব্যর্থ হলো। অদেখা আগুনের হলকায় পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কণিকা।

মাথায় রক্ত উঠে কণিকার ম্যানেন্‌জাইটিস হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎ-সায় সেটা কমলো বটে ধীরে ধীরে; কিন্তু সুস্থ চেতনা আর ফিরে পেলো না কণিকা।

চোখের জলে ভাসলো লতা। কাঁদলো পরিচিত লোকেরা। অব্যক্ত চিৎকারে তুমড়ে গেল বৃদ্ধ কাকুর এতদিনের শক্ত বুকখানা।

দিন যায়। রাত কেটে যায় একটার পর একটা। কণিকার মন থেকেও মুছে যায় একটার পর একটা সব স্মৃতি—সমস্ত পরিচিত মুখ।

কাকু আসে। লতা সামনে বসে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কত পরিচিত মুখ, কত আপন জন। কিন্তু সবই অপরিচিত ঠেকে কণিকার। সকলকে দেখে। চমকে সরে বসে। কখনো হাসে। কখনো কাঁদে।

কখনো ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয় সেই এক কথায় চিৎকার ক'রে—দূর হও। দূর হয়ে যাও।

*　　　　　*

দূর হলো। সত্যিই সব দূর হয়ে গেল ধীরে ধীরে। কণিকার জীবন শূন্য ক'রে সবই দূর হয়ে গেল। কিছু আর রইলো না।

তার বিধাতা-পুরুষ সব দূর ক'রে দিলেন তার মন থেকে নিঃশেষে। এমনকি তার জীবনের পরম ধন, তার আশা আকাঙ্ক্ষা—সেই অবনীর স্মৃতিও সম্পূর্ণরূপে মুছে গেল। হারিয়ে গেল তাদের মধুর সম্পর্কের দিনগুলো বিস্মৃতির অতল গর্ভে। একটিবারও আর মনে পড়ে না সেই প্রিয়তম মানুষটাকে।

লতা বলেছিলো তার কথা। কাকু শুনিয়েছিলো তার নাম। কিন্তু এতটুকুও পরিবর্তন করতে পারেনি কণিকার বিস্মৃতিকে। তেমনি নিরলস দৃষ্টিতে সে শুধু তাকিয়ে ছিল দূরের অকাশটার দিকে।

শুনলো সবাই। জানলো, কণিকা সহজে সারবে না। একটা বড় রকমের শক্ লেগে বিকল হয়ে গেছে কণিকার সকল স্মৃতি-শক্তি।

লতার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কণিকা-অবনীর মুখ দুটো। মনে পড়ে তাদের রঙিন্ আশাময় দিনগুলোর শত কাহিনী। বিস্ময়ে অভিভূত হয় সে। অব্যক্ত এক বেদনার নিষ্পেষণে ঝরে পড়ে তার চোখর জল নিঃশব্দে।

কি হতে পারতো কণিকা? কিন্তু কি হয়ে গেল আজ? অবনী শুনবে তার সত্যকার পরিচয়। হয় কাঁদবে, নয় পাথর হয়ে যাবে সেও। আর কোন দিনও আসবে না কণিকার কাছে। কটা মুহূর্ত্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে তাদের এতদিনকার সব আশা, সমস্ত স্বপ্ন—ঘর বাঁধবার রঙিন কল্পনা নিঃশেষে। নিরঙ্কুশ ভাবে।

*　　　　　*

পূব থেকে পশ্চিমে ঘুরতে ঘুরতে এরপর পৃথিবী আরও এগিয়ে এলো

খানিকটা। কেটে গেল সাত-সাতটা দিন। দেখতে দেখতে সময় হয়ে এলো অনিমা-সেবা-সদনের বর্ষিক উৎসবের।

ইতি মধ্যে অবনী সব ভার কাকুর আর লতার ওপর তুলে দিয়েছে। সে আবার পাড়ি দিচ্ছে সুদূর পশ্চিমে। হয়তো এই তার শেষ যাত্রা।

কণিকার সিট্ রির্জাভ হয়ে গেছে মেণ্টাল-হসপিটালে। হয়তো তারও এটা জীবনের শেষ অধ্যায়।

এলো শ্রাবণ পূর্ণিমা।

নিঃশব্দে পালন হলো সেবা-সদনের প্রথম তিথি উৎসব। অনুষ্ঠানে কিছুক্ষণের জন্য কয়েকজনার সঙ্গে অবনী আর কণিকাকেও এনেছিল লতারা। তারপর অনুষ্ঠান শেষে ফিরে গিয়েছিল নীরবে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তখন। সেবা-সদনের বাইরে অনিমার ষ্ট্যাচুর কাছে দাঁড়িয়েছিলেন কাকু। তারই সামনে দিয়ে তু'খানা গাড়ি মন্থর গতিতে বেরিয়ে গেল পর পর। একটাতে গেল অবনী। আর একটাতে কণিকা। একজন চলেছে চিরদিনের মত দেশ ছেড়ে অজানার পথে। আর একজন চল্‌লো বাকী জীবনটা কাটাতে উন্মাদ-আশ্রমে।

নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে আরও এক গভীর নিস্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কাকু স্থানুর মত। আরও স্পষ্ট ক'রে তাকাতে চাইলেন সামনের দিকে। কিন্তু আর তাদের দেখতে পেলেন না। চোখ তুটোতে নেমে এলো একরাশ অন্ধকার। ঝাপ্‌সা হয়ে গেল দৃষ্টি। অনিমার মূর্ত্তির তলায় বসে পড়লেন অবস দেহে। রাত তখন গভীর। অন্ধকার—গাঢ়তর।

———